প্রথম অধ্যায়

উনিশ শতকের নবজাগরণ ও বাঙালী মুসলমান সমাজ

ভূমিকা ঃ রেনেসাঁস ও বাংলাদেশ

১.

বাংলা সাহিত্যে যে সব মুসলমান সাহিত্য সেবক অবতীর্ণ হয়েছেন মীর মশাররফ তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। পলাশীর যুদ্ধের পর মুসলমান সমাজ যখন আধুনিকমনস্কতা থেকে সরে গিয়ে নিজস্ব সমাজ ও শরীয়তের মধ্যে আত্মমগ্ন হয়েছিলেন তাঁদের তখনকার চেতনায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা উপেক্ষিত হয়েছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আবার মুসলমান সাহিত্যিকেরা বাংলা গদ্য অবলম্বন করে আধুনিক সাহিত্যের অঙ্গনে উপস্থিত হন। বাংলা সাহিত্যের সাধনায় তাঁর কালের আর যে সব সাহিত্যকার আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁরা এখন প্রায় সকলেই ইতিহাসের পাতায় আত্মগোপন করে আছেন। এঁদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্য সম্ভার এখনো সংস্কৃতি সচেতন মানুষের কাছে জীবন্ত রসবস্তু হিসাবে মূল্যবান। প্রায় শতবর্ষ কালের ব্যবধানেও তাঁর রচনাবলী এখনো পুনঃ পুনঃ পঠিত হচ্ছে এবং নিত্য নতুন বিশ্লেষণে তাঁর রচনাবলীর গুণ নির্ণয় হচ্ছে। বিশেষ করে তাঁর 'বিষাদসিন্ধু' ও 'জমীদার দর্পণ' বাংলার পাঠকদের কাছে যে মর্যাদা লাভ করেছে তা বিস্ময়কর। অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর 'বিষাদসিন্ধু' পাঠ করে 'বিচলিত' হয়েছিলেন।[১] বহু রসিক পাঠক তাঁর এই গ্রন্থ পাঠ করে অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি। তাঁর 'জমীদার দর্পণ' আধুনিক বিংশ শতকেও অত্যাচার ও পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নাটকের মর্যাদা লাভ করেছে। এই সব কারণে মীর মশাররফকে সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যের একজন 'সার্থক শিল্পী'র[২] মর্যাদা দেওয়া হয়। মশাররফ হোসেনের সতীর্থ সাহিত্যসাধক শেখ আব্দুর রহিম তাঁকে মুসলমান সমাজের 'ধ্রুবতারা' হিসাবে আখ্যা দিয়েছিলেন।[৩]

মীর মশাররফ হোসেনের জীবৎকাল (১৮৪৭ - ১৯১১) নানা দিক থেকে বাংলাদেশ ও বাঙালী সংস্কৃতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর জন্মের প্রায় অর্ধশত বৎসর পূর্বে এদেশে আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির স্পর্শে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের নবোন্মেষ ঘটেছে। চিন্তা-জগতে এবং ভাবের জগতে এই পাশ্চাত্য প্রেরণা বাঙালীর জীবনকে নবজাগ্রত চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। মীর মশাররফ বাংলাদেশের এই নবজাগরণের যুগের মানুষ। ঐতিহাসিকেরা ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় শতবর্ষকালকে বাংলার নবজাগরণের কাল বলে অভিহিত করেছেন[৪]। দু বছর ব্যবধানে এদেশে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮১৭ সালে। কেউ কেউ ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নবজাগরণের কাল গনণার পক্ষপাতী। এই শতবৎসর বাংলাদেশ ও বাঙালী জীবনের নানা গঠন, নূতন জীবনরস ও জীবনচেতনায় উদ্বোধিত হয়ে ওঠার কাল। এই কালে আমাদের সমাজ, অর্থনীতি ও সাহিত্যের নানা পরিবর্ধন ও পুষ্টি সাধন হয়। সুশোভন সরকার বলেছেন, 'বুর্জোয়া অর্থনীতি এবং আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির'[৫] প্রবল প্রভাবেই নবজাগরণের চেতনা প্রথমে জাগে। এই নবজাগরণের মূলধর্ম মানবতা এবং ঐহিক বোধ। এরই ফলে মানুষের ইহ জীবনকে পূর্ণতররূপে উপলব্ধি করবার প্রেরণা জাগে।

২.

যাকে নবজাগরণ বলা হয় ভন মার্টিনের কথা উদ্ধৃত করে বিনয় ঘোষ দেখিয়েছেন, আসলে তা মধ্যযুগীয় চিন্তার সঙ্গে বিচ্ছেদ। রেনেসাঁসের যুগকে মধ্য যুগের থেকে স্বতন্ত্র বলে ভাবা রেনেসাঁসের ইতিহাসকারেরাই শুরু করেছিলেন। ভন মার্টিন বলেছেন রেনেসাঁস হচ্ছে "first cultural and social breech between the middle ages and modern times"[৬] বিনয় ঘোষ এই cultural and social breech-এর মূল কথা ভেবেছেন সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের পার্থক্য। তিনি লিখেছেন, "আধুনিক যুগ বলতে এখানে ধনতান্ত্রিক যুগের কথা বলা হয়েছে"।[৭] বিনয় ঘোষ তাঁর 'বাংলার নবজাগৃতি' গ্রন্থেই দেখিয়েছেন, ইংরেজরা এদেশে বুর্জোয়া অর্থনীতিক ব্যবস্থার পত্তন করে। সুশোভন সরকারও তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, 'বুর্জোয়া অর্থনীতি'র প্রভাবেই বাংলার রেনেসাঁস সূচিত হয়[৮]। বিনয় বাবু তাঁর গ্রন্থে নানা বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন ইংরেজরা আমাদের এশিয়াটিক স্বনির্ভর সমাজ ভেঙে ফেলে। তারা ভূমিরাজস্ব পদ্ধতি বদলে ফেলে, ভূমির ব্যক্তিগত স্বত্বহীনতা[৯] লোপ করে ও স্থিতিশীল সমাজের ভিত্তি ভেঙে দেয়। এতে আমাদের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে[১০]। ব্রিটিশ পুঁজির স্বার্থে এদেশের কাঁচামাল বিলেতে সরবরাহ হয়, চা-বাগান তৈরী হয়, নীলচাষ হয়, আবার রেলপথ ও কলকারখানার পত্তন ঘটে, নানাবিধ যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়। এইভাবে আমাদের পুরাতন অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ে[১১] এবং এদেশে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সূচনা হয়। নানাবিধ যন্ত্র-ব্যবহার, মুদ্রণ-যন্ত্র স্থাপন, রেল ব্যবস্থা, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, আধুনিক বুর্জোয়া অর্থনীতির সূচনা করে। বিনয় ঘোষ এগুলিকেই বলেছেন নবজাগৃতির প্রথম দূত।[১২] এরাই এদেশের পুরানো সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলে। এদেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ-এর মূল এখানেই।[১৩] বিনয় বাবু লিখেছেন, ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে আধুনিক যুগের সম্পর্ক ওতপ্রোত। অথচ ভারতবর্ষে এই ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্পূর্ণ হয়নি।[১৪] পরাধীনতা এর অন্যতম কারণ। এই কারণে এদেশের নবজাগৃতির পরিসর অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। একথা ঠিক আমাদের দেশে বুর্জোয়া অর্থনীতির বিকাশ হয়নি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। কিন্তু এর ফলে এদেশের নবজাগরণকে একেবারে 'অতিকথা' বলতে চাননা অনেক ঐতিহাসিক। বিনয় বাবু বলেছেন এদেশে পাশ্চাত্য নবজাগৃতির কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি, যা ঘটেছে সেটা সংস্কৃতি সংঘাত জনিত আদর্শের আদান-প্রদান বা মিশ্রণ।[১৫] একথা একটু অন্যভাবে ইতিবাচক দিক থেকে বলেছেন অমলেশ ত্রিপাঠী। "আমাদেরটা পুরো পশ্চিমের imitio বা অনুকরণ নয়। পশ্চিম ও পূর্বের বীজের সঙ্কর ভারতের মাটিতে পড়ে যে ফসল ফলিয়েছে — তাই।[১৬] বিনয় বাবু রেনেসাঁসকে মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের বিচ্ছেদ বলে যে ব্যাখ্যা করেন সেই রকম প্রকৃত বিচ্ছেদ কিন্তু হয়না। তিনি বলেছেন,

> মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিচ্ছেদ ঘটে রেনেসাঁসের যুগে এবং সেইদিক থেকে রেনেসাঁসকে আধুনিক যুগের প্রথম উদয় পর্ব বলা যায়। যুগ থেকে যুগান্তরে যাত্রার পথে কখনও অতীত যুগের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামাজিক সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদ ঘটেনা, বিচ্ছেদের শক্তিগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে — সমাজের মূল গঠন বিন্যাসের পরিবর্তনের ফলে। এই মূল গঠন বিন্যাস অর্থনৈতিক, যার ভিতর দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সমাজের গোষ্ঠীবিন্যাস ও শ্রেণী বিন্যাস গড়ে ওঠে এবং তার উপর ভিত্তি করে সমাজের ধ্যান-ধারণা ভালমন্দ বিচারবোধ সবকিছুর বিকাশ হয়।[১৭]

বিনয়বাবুর মূল জোরটা অর্থনীতির উপর। অমলেশ ত্রিপাঠী হুইজিঙ্গার-এর সাক্ষ্য উদ্ধৃত করেছেন এই কথা জানাতে

যে কোনোভাবেই দুই যুগের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ সম্ভব হয় না ঃ

> The renaissance cannot be considered as a pure contrast to medieval culture, not even as a frontier territory between medieval and modern times.[১৮]

আজকাল বরং প্রবহমানতার উপরেই জোর দেওয়া হচ্ছে। এই অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে অতীতের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেনা বরং ঐতিহ্যের মধ্যেই প্রগতির সম্ভাবনা দেখা যায়।[১৯] "আমাদের মনে রাখতে হবে আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির বিবর্তনে একটা মুখ্য প্রবণতা ছিল ঐতিহ্যের সাহায্যে আধুনিকীকরণ"।[২০] এইকথা আমাদের রেনেসাঁস যুগের মনীষীরা জানতেন তাই "সীমিত শক্তিতে সীমিত ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলিকে আধুনিকীকরণের কাজে তাঁরা লাগিয়েছিলেন"।[২১] বহিরাগত ভাবসংঘাতের ফলে প্রকট সাংস্কৃতিক সামাজিক আলোড়নকে এইজন্য সীমিত অর্থে বিনয়ঘোষ রেনেসাঁস বলতে অরাজী নন।[২২]

৩.

রেনেসাঁসের ইতিহাস রচনা করেছিলেন যে ঐতিহাসিকেরা তাঁরা দেখিয়েছিলেন মধ্যযুগের মানুষের চেতনা ধর্মবিশ্বাস এবং প্রথানুগত্যের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। ব্যক্তি ছিল সমাজ শাসনে নিস্পিষ্ট। ব্যক্তির মুক্তি ও বিকাশ, যুক্তিবাদের অভ্যুদয় এবং মানবমুখিনতা এইগুলি হল রেনেসাঁসের বিশিষ্ট লক্ষণ। এইজন্য এইযুগকে বলা হয়েছে মানবিকতার যুগ, মানুষই এর মূল।

এই দিক দেখলে বলা যায় উনিশ শতকের বাংলাদেশে মানবমুখী জীবন-চেতনা প্রথম স্পষ্ট হয়ে উঠল। নবজাগরণের যাঁরা অগ্রদূত তাঁরা প্রত্যেকেই মানুষের ঐহিক জীবনের গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। কিন্তু বলা উচিত আমাদের এই মানববোধের পাশাপশি অধ্যাত্মচেতনা কোনোদিন সম্পূর্ণ বর্জিত হয়নি। এখানেও secularism –এর পাশাপাশি ধর্মের প্রকাশ ঘটেছে।[২৩] রেনেসাঁসের আরেকটি ধর্ম ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য চেতনা। আগে বিনয় ঘোষের কথা অনুসরণ করে দেখেছি আর্থনীতিক পরিবর্তন থেকেই এই স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ হয়। এই যুগে এটিরও কিছু লক্ষণ স্পষ্ট হল। ব্যক্তির স্বাধীন মত প্রকাশে, ধর্মমত গ্রহণে এবং সমাজের বিরুদ্ধতার মধ্যেও নিজমত প্রকাশের স্বাতন্ত্র্যে এই ধর্মের প্রকাশ দেখতে পাই। এর সঙ্গে যুক্ত হল যুক্তিনিষ্ঠা। সুশোভন সরকারের চমৎকার বিশ্লেষণ মনে রেখে বলা যায় রেনেসাঁসের যুগে প্রাথমিক চেষ্টাটা ছিল সামাজিক সংস্কার। সমাজের নানা কুসংস্কারাছন্ন, অযৌক্তিক ও অন্যায় প্রথাকে আক্রমণ করা– সেই সূত্রেই এল যুক্তি। সংস্কারকেরা নিজেদের বক্তব্যকে যুক্তির উপর দাঁড় করালেন"।[২৪] যুক্তিবাদের উপর এখন সব কাজকে দাঁড় করানোর চেষ্টা আরম্ভ হলো। এরই উপর নির্ভর করে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আঘাত হানা হ'ল। মানুষের ইহমুখিনতাকে এই যুক্তিবাদ আরও প্রসারিত তাৎপর্য দিতে পারলো। শাস্ত্র, ধর্ম, দেশাচার, আর জনশ্রুতি থেকে এবার যুক্তির সাহায্যে মানুষের জীবনকে পরীক্ষা করা সম্ভব হল। এরই ফলে যেমন ধর্মানুশাসনের প্রতিপত্তি থেকে মানুষ মুক্তি পেলো তেমনি ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠা পেলো। প্রতিষ্ঠা পেলো মানবতাবাদ। এই ধর্মানুশাসন ও সমাজ আচারের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ কিছুটা যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল। এই বিহ্বলতা নব্যবঙ্গীয় যুবকদের আচরণে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তারা ধর্ম এবং সমাজের প্রতি এমনই আঘাত হানতে উদ্যত হল যাতে দীর্ঘদিনের স্থবির সমাজের জড়তা ভেঙে যায়। এরই সঙ্গে উল্লেখ করা যায় এই কথা

যে রেনেসাঁসের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র কিন্তু এদেশে প্রকাশ পায় নি। ধর্মসংস্কার ও নূতন যুক্তিবুদ্ধির উপর ধর্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো। ধর্মকে মানুষের জীবনাভিমুখী করে গড়ে তোলারও কাজ শুরু হল। মধ্যযুগের ধর্মনীতি ও সমাজানুশাসন মানুষের মনুষ্যত্বকেই খর্ব করে রেখেছিলো। তার ব্যক্তিবোধ ছিল অপুষ্ট ও অপরিণত। গতানুগতিক ধর্মচর্চার স্থানে দেখা দিল নবগঠিত ধর্ম ভাবনা। এর সঙ্গে উল্লেখ্য নারীর জীবনাধিকারের মর্যাদার কথা। মানবজীবনের তাৎপর্য পরিবর্ত্তিত হলো বলে এখন সমাজ অনুশাসন থেকে নারীর জীবনকে মুক্ত করবার প্রয়োজন দেখা দিলো। নারীমুক্তির চেতনার সূচনা হল এই উনিশ শতকে। সতীদাহ প্রথার বিলোপ সাধন, বিধবা-বিবাহ প্রথার প্রবর্তন, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ ও কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন এই নারী মুক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক অবস্থান থেকে মুক্ত করে নারীর জীবনাধিকার প্রতিষ্ঠার কাজ অত্যন্ত জরুরী ছিলো। এরই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে আগ্রহ, ইতিহাস চেতনা ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষের প্রসঙ্গ। নবযুগের চিন্তানায়কেরা এই রাজনীতি এবং জাতীয়চেতনা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন।

৪.

রামমোহন রায়কে প্রায় সকল চিন্তাশীল মানুষই ভারতের ইতিহাসের আধুনিকতার অগ্রদূত বলে বর্ণনা করেছেন।[২৫] তাঁকে অনেকেই যুগ প্রবর্তকের সম্মান দিতে চান।[২৬] রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর আবির্ভাবকালে এদেশের ইতিহাসের মজা নদী শুষ্ক হয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতিতে তিনি এদেশের সর্ববিধ পুনর্জীবনায়নের "Social, religious intellectual and political regeneration"[২৭]— এর কাজ করে গেছেন। তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার মধ্যে যে প্রধান বৈশিষ্ট্যটি ঐতিহাসিকেরা লক্ষ করেছেন তাকে সুশোভন সরকার বলেছেন সংশ্লেষণ, "Rammohun worked out a synthesis of the best thought of the East and the West"[২৮] অবশ্য এই সংশ্লেষণের তত্ত্ব পরে তিনি কিছুটা পরিবর্তন করে প্রতীচ্যবাদী ধারণার গুরুত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[২৯] প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞান তিনি আত্মীকরণ করেছিলেন। এসবই দেশের মানুষের সর্বাঙ্গীন পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। তিনি ভেবেছিলেন নূতন যুগের ভারত প্রতিষ্ঠিত হবে যুক্তিবাদের উপরে – পূর্ব এবং পশ্চিমের জ্ঞান তাকে গঠিত করবে। এই ভারত পশ্চিম থেকে গ্রহণ করবে নিশ্চয় কিন্তু এই গ্রহণ হবে এমন একটা "Creative Process" এর মাধ্যমে যাতে ভারতীয় চিন্তা এবং সংস্কৃতির পুর্নজন্ম 'renovated' [৩০] হয়।

রামমোহনের চিন্তার নির্যাস গ্রহণ করলে দেখি তিনি হিন্দুর পৌরাণিক যুগের বহুদেবনির্ভর ধর্মকে পরিত্যাগ করে তাকে একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর পুরোহিততন্ত্রের প্রখর সমালোচনা এবং মূর্তিপূজার বিরুদ্ধতা কে সুশোভন সরকার 'প্রোটেস্ট্যান্ট বিপ্লবের' সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৩১] একে রামমোহনের নয়া উদারবাদ 'New leberalism'[৩২] বলা হয়েছে। সুশোভন বাবুও তাঁর লেখায় এই পুরোহিত তন্ত্র ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তিবাদের দ্বন্দ্ব দেখেছেন।[৩৩] রামমোহন আমাদের অধঃপতিত ধর্ম ও সমাজকে বেদান্তবাদের অভিমুখে নিয়ে গিয়ে যেমন একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা করলেন তেমনি তার দ্বারা ভারতীয় সমাজের ঐক্য রচনার কাজও করলেন। এই কারণে ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন তাঁর বড়ো কাজ। তিনি জাতিভেদ প্রথাকে ভারতীয় ঐক্যের প্রধান প্রতিবন্ধক বলে মনে করেছিলেন। এরই ফলে আমাদের সমাজে অনৈক্য এবং বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন,

> the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest. The distinction of castes introducing innumerable divisions and sub-divisions among them has entirely deprived them of patriotic feeling.[৩৪]

বেদান্তের একেশ্বরবাদ ও জীব-শিব ঐক্যের তত্ত্ব ব্যবহার করে এই বিভেদ যে ঘুচিয়ে ফেলা তত্ত্বগতভাবে সম্ভব তা বোঝা যায়। নারীর অধিকার, সতীপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, নূতন শিক্ষার প্রবর্তনের চেষ্টা এবং জাতীয় সচেতনতা ও সংস্কারের জন্য তার সংগ্রাম — এসবই তাঁর নবযুগের চিন্তা-নায়কোচিত ভূমিকা। সুশোভন সরকার লিখেছেন ঃ "Inspired with new ideals of life Rammohun was breaking away from the tradition of passivity so congenial to feudal times."[৩৫] আগেই উদ্ধৃত করেছি জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত। জাতিভেদ প্রথাই যে মানুষকে বিছিন্ন করেছে সে বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা দেখেছি। এই কারণে ধর্মসংস্কারের প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন। রামমোহনের চরিত্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আন্তর্জাতিক বিষয়ে তাঁর উৎসাহ। বিপান চন্দ্র তাকে বলেছেন 'Firm believer in internalism'।[৩৬] রামমোহন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছিলেন, তিনিই প্রথম আধুনিক যুগের তাৎপর্য অনুধাবন করেছিলেন। এইসব কারণে তাঁকে রেনেসাঁসের পথিকৃৎ বলা হয়।

রেনেসাঁসের যে বৈশিষ্ট্য রামমোহনের চিন্তায় ও কর্মে পরিস্ফুট হয়েছিলো তাঁর সহযোগীরাও সেইসব কর্মে খুব উজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কালেই ১৮২০-৩০-এর মধ্যে আরো প্রগতি-চিন্তক একটি নব্যবঙ্গীয় আন্দোলন তৈরী হয়। হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন এর প্রেরণা। ডিরোজিওকে কেন্দ্র করে সেকালে একদল নব্যশিক্ষিত ছাত্র একটি অধিকতর বৈপ্লবিক ধারণা গড়ে তুলেছিলেন। এঁরা যুক্তিবাদকে আরো প্রসারিত করেন এবং রাজনীতি সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হয়ে ওঠেন। বাংলার নবজাগৃতির যে মৌলধর্ম সুস্থ মানবতাবাদ তাকে এরা আরো প্রবলতর করে তোলবার কাজে ব্যাপৃত হন। তাঁরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, শ্রমিকদের দুরবস্থা বিষয়ে এবং ইংরেজিকে রাজকার্যের ভাষা হিসাবে স্বীকৃতিদানের আন্দোলন করেছিলেন। তাঁদের কাজের মধ্যে মুখ্য দুটি প্রবণতা ছিলো — রাজনীতি-মনস্কতা এবং প্রচলিত সামাজিক প্রথার বিরোধিতা। এই কারণে এই দেশের সমাজে তাঁরা একটা প্রবল আলোড়ন তুলেছিলেন। অবশ্য তাঁরা সমাজ সংস্কারে স্থায়ী কোনো চিহ্ন রেখে যেতে পারেন নি। কারণ সুশোভন বাবুর মতে, তাঁরা পাশ্চাত্যের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিঘাতেই আন্দোলিত হয়েছিলেন, কিন্তু ঐ বিপ্লবের তাৎপর্য ঠিকমতো আত্মস্থ করতে পারেন নি।[৩৭] ফলে কতকটা চাঞ্চল্য তৈরী করা ছাড়া অধিক কিছু তাদের দ্বারা সিদ্ধ হয়নি।

রামমোহন বেদান্তের অদ্বৈতবাদকে ফিরিয়ে এনে একই সঙ্গে ধর্ম এবং সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ধর্ম সংস্কারে ঐহিকতা মুখ্য ছিল। বিদ্যাসাগর কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেও প্রত্যক্ষ ধর্মের আচরণ করেন নি। বরং মানুষের ঐহিক জীবনকে কিভাবে উন্নত করা সম্ভব তা নিয়ে চিন্তা করেছেন। এদিক থেকে বলা যায় তিনি ছিলেন নবজাগরণের যুগের ভাব চেতনাসম্পন্ন আধুনিক মানুষ। তাঁর হাতে বাঙালীর সংস্কৃতি তিনদিক থেকে পুর্ণগঠিত হয়ে উঠলো।

১. সমাজ ঃ নারীর জীবনাধিকার প্রতিষ্ঠা

২. শিক্ষা ঃ পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহ

৩. সাহিত্য ঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নির্মাণ

এই তিনটিই বাঙালীর নবজাগ্রত জীবনচেতনার প্রত্যক্ষ ফল। বিদ্যাসাগর হিন্দু-বাঙালী নারীর জীবনে বৈধব্যকে নিষ্ঠুর অভিশাপ রূপে দেখেছিলেন। প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রের যুক্তি মন্থন করে এবং তদানীন্তন সরকার ও প্রগতিশীল মানুষের সমর্থনে তিনি যে বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করেন তাকে তিনি তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম বলে অভিহিত করেছেন। এই কাজের মূল্যায়ণ করে আমরা বুঝতে পারি বাঙালী সমাজে তা সুফলপ্রসূ হয়নি। কিন্তু যে প্রবল শক্তিতে তিনি বাঙালী হিন্দু সমাজকে নাড়া দিয়েছেন তাতে তার ভিত্তির স্থবিরতাও কেঁপে উঠেছিল। সন্দেহ নেই বাঙলার বৃহৎ মুসলমান সমাজ এইসব সংস্কার আন্দোলনের দ্বারা উপকৃত হয়নি। কিন্তু অন্যভাবে দেখলে বুঝতে পারা যায় রামমোহন বা বিদ্যসাগরের নারী জীবন-কেন্দ্রিক সংস্কার-আন্দোলন কোন একটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের কাজ ছিলনা। তা ছিল সমগ্রভাবে নারীমুক্তির এক-একটি ধাপ। রামমোহন শুধু সতীদাহ প্রথা রদের কাজটুকু করেননি, নারীর জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজও করেছিলেন। বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। অর্থাৎ নবজাগৃতির ফলে উদ্ভূত যে মানববোধ তারই ফলে অগ্রণী চিন্তানায়কেরা বাঙলাদেশের নারী জীবনের প্রতিবন্ধকতা দুর করে তাকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেবার কাজ শুরু করেছিলেন। এ কাজের পরোক্ষ প্রতিক্রিয়ায় মুসলমান সমাজের মধ্যে নারীমুক্তির কাজ হওয়া সম্ভব ছিলো। অবরোধ প্রথা দূরকরা, নারীর শিক্ষা এবং বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সেই ক্ষেত্রে বিশেষ কাজ হতেও পারত। কিছু কিছু হয়েওছে। ফলকথা নারীমুক্তি-কেন্দ্রিক যে আন্দোলন বাঙলাদেশে শুরু হয় তার মূল এই নবজাগরণের চেতনায় নিহিত ছিল। নারীর জীবনকে সামান্যতম হলেও সফলতা দেবার কাজ করেছিলেন বিদ্যসাগর। যে উদ্যম ও অধ্যবসায়ে তিনি বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ও প্রচলন করেন তা এককথায় বিস্ময়কর। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁর অদম্য উৎসাহ ছিল। বেথুন কলেজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট যোগ যেমন ছিলো তেমনি তিনি বিভিন্ন জেলায় তিনি কতকগুলি বালিকা বিদ্যলয় স্থাপন করেছিলেন।[৩৮] তাছাড়া সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের দ্বার অব্রাহ্মণ হিন্দু ছাত্রদের জন্য খুলে দেওয়া এবং সংস্কৃত কলেজের পাঠক্রমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রেও তাঁর শিক্ষাসংস্কারের ভূমিকার গুরুত্ব ছিল।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব ছিলো অপরিসীম। এই বাংলা সাহিত্যই এই পর্বে নবজাগরণের ভাব প্রকাশের অধিক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। মানবতাবাদ, যুক্তিনিষ্ঠা এবং নারীর জীবনাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে অবলম্বন করে বাঙালীর যে নব্য যুগের সাহিত্য গড়ে উঠেছে বিদ্যসাগর তার একজন ভাবুক ও নির্মাণকর্মী। তিনি যেমন চিন্তা করেছেন তেমনি নির্মাণ করেছেন। তাঁর সমাজ ভাবুকতাকে তিনি নিজের গদ্য রচনাবলীতে ব্যক্ত করেছেন। এতে একদিকে যেমন চিন্তানায়ক হিসাবে তিনি বাঙালীর সাহিত্যকে যুক্তি, বুদ্ধি ও মানবধর্মের উপর স্থাপন করেছেন তেমনি বাংলা গদ্যের নির্মাণ-শিল্পে তাঁর অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের মুদ্রা অঙ্কন করে গেছেন। সাহিত্যের দিক থেকে বিদ্যসাগরের রচনাবলীর যে মূল্য তা অনেকটাই আদি কর্মিকের, কিন্তু গদ্যের নির্মাণে তিনি স্থপতি। তাঁর শক্তিকে তিনি কল্পনামূলক সৃজনধর্মে রূপায়িত করেন নি বরং বাংলা গদ্যে শক্তি সঞ্চার করে

তাঁর যুগের ধর্ম ও দায়িত্ব পালন করেছেন।

বাংলা গদ্যের এই শক্তি পরবর্ত্তীকালের সাহিত্য সৃষ্টিতে আরো বহুরূপ ভঙ্গিমায় নিজস্ব শক্তির বিকাশ ঘটিয়েছে। বাংলার নবজাগরণের এই প্রভাব কিন্তু বাঙালী মুসলমান সমাজের মধ্যযুগীয় তন্দ্রা ঘুচিয়ে তাকে আধুনিক যুগের ঊষালোকে মুক্তি দিতে পারে নি। ইংরেজী সংস্কৃতির সংস্পর্শ-জনিত কারণে বাঙালী হিন্দুর সমাজে শিক্ষার হার বেড়েছে; নূতন ভাবচিন্তার স্পর্শে তার চিত্তের জড়তা কাটতে শুরু করেছে। সম্পূর্ণভাবে সারাদেশের মানুষের জীবনের জড়ত্ব তাতে ঘোচেনি। বাংলার রেনেসাঁস মাত্র নাগরিক মধ্যবিত্ত ইংরেজি শিক্ষিত মানুষের সীমাবদ্ধ পরিসরের বস্তু হয়েই থেকে গেছে। সমস্ত দেশের মানুষের জীবনে তার প্রভাব পড়েনি। গ্রামীণ হিন্দু বাঙালী ও বিশেষত বাঙালী মুসলমান সমাজে তার প্রভাব প্রায় পড়েনি। তাঁদের মধ্যে শিক্ষার হার কম; মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমান সমাজের বিকাশও দেরীতে হয়েছে। নারীর জীবনে নানা সমস্যার প্রতিও মনোযোগ পড়েনি। সমাজ ঐতিহাসিকেরা এর নানা কারণ অনুসন্ধান করেছেন। প্রথমত ইংরেজরা এদেশ অধিকার করে নেবার ফলে তাদের অনেকেই চাকরী হারায় এবং একটা বড়ো অংশ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত ফরসী ভাষা রাজকীয় কার্যে যে মর্যাদা পাচ্ছিল ইংরাজি সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তারা আরো পিছিয়ে পড়লেন। ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রতি কিছুটা অনীহা কিছুটা সুযোগের অভাবে তাঁরা নবযুগের ভাবকেন্দ্রের বাণী আত্মস্থ করতে পারলেন না। ১৮৪৯ সালে, ইংরেজি ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শকে গ্রহণ করে যে ব্যক্তিসত্তার জাগরণ হিন্দু সমাজে সম্ভব হয়েছিলো মুসলমানরা তা থেকে পিছিয়ে পড়লেন। একটি হিসেব থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের ১৩টি স্কুল কলেজের মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার অতি সামান্য অংশই ছিল মুসলমান ছাত্র।[৩৯] ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারার পিছনে যেমন তাদের মধ্যে সচেতন দিক-নির্দেশের অভাব ছিলো তেমনি ইংরেজ সরকারেরও একটি অনুদার ভূমিকা ছিলো। ইংরেজরা প্রথমদিকে মুসলমানদের প্রতি আস্থা রাখতে পারেনি। তারা তাদের সন্দেহ করেছে। মুসলমান সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সচেতনতার অভাব দেখা দিয়েছিলো। এই যুগোচিত শিক্ষার এবং সমাজের সংস্কারের অভাবে তারা ক্রমশ বেশী করে নিজেদের প্রথাবদ্ধ সমাজ এবং ধর্মের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে তাঁরা ক্রমশ হতাশা ও নিস্ক্রিয়তার মধ্যে হারিয়ে যেতে থাকেন। এবং বেশী করে ধর্মকে আশ্রয় করেন। ওয়াকিল আহমদ লিখেছেন ১৮৩৭ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত কাল মুসলমান সমাজের পতনের কাল।[৪০] হিন্দু সমাজ কিন্তু তখন অগ্রগতির স্বপ্ন দেখছে।

৫.

রামমোহনের মধ্যে রাজনীতি চেতনা ও আন্তর্জাতিকতার প্রথম অস্পষ্ট সূচনা হলেও তিনি ইংরেজ শাসনের প্রশংসা করতেন। তিনি "সামাজিক ও ধর্মীয় মুক্তি এবং ব্যক্তিগত মানুষের চিন্তায় মননে ও আচরণে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছিলেন।"[৪১] এই দাবীর সার্থকতা এই যে সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে তিনি দেশবাসীর চিত্তকে গড়ে তুলে বৃহৎ মানবতার মধ্যে তাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। এই কারণে তিনি ইংরেজ শাসনকে স্বীকার করতেন। কেননা তাঁর মনে হয়েছিলো ইংরেজ শাসনে "জ্ঞানের বিস্তার, যুক্তিবাদ, অধিকার বোধ, গণতান্ত্রিক চেতনা"-র[৪২] উদ্ভব হয়েছিলো। এই কারণে ইংরেজ জাতিকে তিনি মুক্তিদাতা ও রক্ষাকর্তা বলেছিলেন। রামমোহনের এই চিন্তার পিছনে যে অর্থে জাতিগঠনের চিন্তা ছিলো পরাধীন দেশে তা সম্ভব ছিলো না। ফলে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতে এদেশের যে

গঠন হল তা বিকৃত এবং বিরূপ। কারণ ইংরেজ এদেশে নিজের শাসনকার্যের উপযোগী যে শ্রেণী গড়বার কাজে শিক্ষাকে ব্যবহার করলো তারা হলো একটি অনুকারক শ্রেণী; সেকালের ভাষায় 'Indian in blood and colour but English in tastes in opinions in moral and intellect' [৪৩] এই নূতন শ্রেণী সেকালের বাঙলাদেশের সমাজের নবসৃষ্ট মধ্যবিত্ত শক্তি। কিন্তু এদেরই হাতে গড়ে উঠলো জাতীয় চেতনার প্রথম মঞ্চ। ভারতবর্ষের সিপাহী বিদ্রোহকে বাঙালী বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সমর্থন করেনি। বিদ্রোহী মুসলমান সমাজ এই ইংরেজ শাসনাধিকারকে অন্তর থেকে গ্রহণ করেনি। এরই প্রতিক্রিয়ায় একদিকে ওয়াহাবী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মুসলমান সমাজ আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলো। এই আন্দোলন কেবল তাদের জাতীয় সংগঠনকারী শক্তি হিসাবে কাজ করলো না, তা ভূমি-নির্ভর কৃষক সমাজের অর্থনৈতিক আন্দোলনও হয়ে উঠলো। এরই সমকালে নীলচাষকে কেন্দ্র ক'রে যে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হলো তা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রজাশক্তিকে সংগঠিত করে তোলে। নীলকরদের অত্যাচারে চাষীদের মধ্যে যে গণআন্দোলন হল তাকে একটি শক্তিশালী গণ-আন্দোলন বলা যেতে পারে। এই গণ-আন্দোলনের ধারায় এর পরেও বেশ কয়েকটি কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়। এই আন্দোলনগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থনীতিকে নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল এবং দরিদ্র প্রজাদের ভিতর থেকেই এর নেতার অভ্যুদয় হয়েছিল। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালীর একাংশ যেমন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ এর বৌদ্ধিক সমর্থনকারী ছিলেন। এই কালেই হিন্দুদের মধ্যে যে জাতীয় রাজনৈতিক সচেতনতা দেখা যায়, তার ঝোঁক হিন্দু মানসিকতার দিকেই ছিল।[৪৪] হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠা, দেশীয় শিল্পের পুনর্জাগরণ এবং দেশপ্রেমের উদ্দীপনার জন্য সাহিত্য রচনা এই হিন্দু জাতীয়তাবাদের কয়েকটি দিক। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি দেশীয় প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়েছে। অনেকগুলি পত্র পত্রিকা সমাজের গঠন কর্মের সৃজনশীল দায়িত্ব পালন করেছে। আর বিশেষ করে গড়ে উঠেছে বাঙালীর সাহিত্য। হিন্দুদের জাতীয়তাবোধ জেগে ওঠার পাশাপাশি মুসলমান সমাজেরও জাগরণ হওয়া বাঞ্ছিত ছিল। কিন্তু তেমনটি হয় নি। এর কারণ আগেই বলেছি মুসলমান সমাজে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর বিকাশে বিলম্ব। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমানদের শিক্ষা সংস্কার ও সমাজের উন্নতির জন্য কাজ শুরু হল। তখনও নানা কারণে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে জাতীয় চেতনার ডাকে সাড়া দিতে পারলেন না। জাতীয় কংগ্রেসকে হিন্দুত্ববাদী প্রতিষ্ঠান মনে করে তাঁরা বর্জন করলেন। পাশাপাশি বসবাসকারী দুই সম্প্রদায়ের মানুষের অসম উন্নয়ণের ফলে এবং বিদেশী শাসকশক্তির কৌশলে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার কারণে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের জীবন বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে গড়ে উঠল। সে বিরুদ্ধতা বিদূরিত হয় নি। বাঙালী মুসলমান সমাজের মধ্যে শিক্ষা ও সমাজের উন্নতির কাজ শুরু হয় এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'র স্থাপনা থেকে কাল গণনা করেছেন ওয়াকিল আহমদ।[৪৫]

উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার চিত্র এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সমস্ত ক্ষেত্রেই মুসলমান সমাজের যেমন পতনের চিত্র লক্ষ করা যায়, তেমনি এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই অবস্থার কিছু পরিবর্তনও শুরু হতে থাকে। অর্থাৎ সমগ্র ক্ষেত্রেই আধুনিক সচেতনতা লক্ষ করা যায়। এই শতকেরই একেবারে গোড়ার দিকে হিন্দু সমাজের মধ্যে যে জাগরণ শুরু হয়েছিলো মুসলমান সমাজে তা শেষার্ধে দেখা দিতে শুরু করে। সুতরাং শিক্ষা, অর্থ, রাজনীতি ও সমাজ সংক্রান্ত মুসলমান সমাজের একটি প্রতিচ্ছবি তুলে ধরলে বিষয়টি স্পষ্টীকৃত হবে।

শিক্ষা

১.

বঙ্গদেশে উনিশ শতকে যে জাগরণ হয় বাংলার হিন্দুদের মধ্যেই তার উৎপত্তি ও প্রসার। প্রথমদিকে দেশের মুসলমান সমাজকে এ জাগরণ প্রকৃত প্রস্তাবে স্পর্শ করেনি। বাঙালী হিন্দুরা কিছু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই শতকের প্রথম থেকেই ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে যান। কিন্তু মুসলমান সমাজ তখন এই গ্রহণের ক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়েন। এই পশ্চাদপদতার কারণেই তাঁদের আধুনিক সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চাও বিলম্বিত হয়।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের এই অনগ্রসরতার পেছনে নানাবিধ কারণ অনুসন্ধান করা যায়। ইংরেজরা এদেশে আসবার আগে মধ্যযুগে হিন্দুদের শিক্ষার জন্য টোল, চতুষ্পাঠী আর পাঠশালা এবং মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা ও মক্তব প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। মুসলমানরা বাংলা শিখতে পাঠশালায় যেতেন তবে আরবী ফারসী ভাষায় ধর্মীয় শিক্ষালাভের কারণে তাঁদের মূলত জোর ছিল মক্তব ও মাদ্রাসায়। আবার মধ্যযুগে মুসলমান আমলে ফারসী রাজভাষা হওয়ায় সরকারী সুযোগ সুবিধে লাভের আশায় হিন্দু-মুসলমান উভয়েই ফারসী শিখতেন। এ ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে তখন উর্দু পারিবারিক ভাষা হিসেবে বেশ গুরুত্ব পেত। অবশ্য তখনকার বিদ্যা-শিক্ষার অবস্থা যে খুব খারাপ ছিল না তা এ্যাডামের রিপোর্ট থেকে জানা যায়।[৪৬] তবে মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষার পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায় ছিল এই ভাষা সমস্যা। আরবী, ফারসী, উর্দু, বাংলা প্রভৃতি একাধিক ভাষা অধ্যয়নের ফলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে মুসলমানদের ক্ষেত্রে নিয়মিত স্কুল-জীবনের প্রারম্ভ বিলম্বিত হত।[৪৭]

২.

ইংরেজ আগমনের পর প্রধানতঃ উনিশ শতকের প্রথম থেকে এদেশে বাঙালী জীবনে ইংরেজি অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হিসেবে দেখা দেয়। কেন না, এই ইংরেজি ভাষা ছিল তখন পাশ্চাত্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতিকে জানবার মুখ্য দ্বারস্বরূপ।

কোম্পানী-আমলের প্রথমদিকে ইংরেজরা এদেশবাসীকে শিক্ষাদানের কোনো প্রয়োজন অনুভব করে নি। ফলে তেমন কোন উদ্যোগও গৃহীত হয়নি। বরং তারা ভারতবাসীর জনসাধারণকে শিক্ষাদান করাটা তাদের স্বার্থের পরিপন্থী এবং সাম্রাজ্যের পক্ষে 'সমূহ বিপদ' বলে মনে করেছে। এ প্রসঙ্গে কোম্পানীর জনৈক ডিরেক্টর স্পষ্ট মন্তব্যই করেছিলেন, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার কারণেই আমেরিকা তাঁদের হাতছাড়া হয়। নতুন উপনিবেশ ভারতবর্ষ সম্পর্কে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটুক তা তাঁরা চান না।[৪৮] সুতরাং সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও অবাধ শোষণের স্বার্থেই তাঁরা প্রথম পর্যায়ে কোন উদার শিক্ষানীতি গ্রহণ করেন নি।

তবে এই সময়ে কোম্পানী সরকারের প্রয়োজনে দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে — কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮০) এবং বেনারস সংস্কৃত কলেজ (১৭৯২)। কিন্তু 'হিন্দু ও মুসলিম আইনজ্ঞ কর্মচারী সৃষ্টি'ই ছিল এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।[৪৯] এছাড়া প্রাচ্যবিদ্যার উন্নতির জন্যে ইউরোপীয় গবেষকদের উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হয়

'এশিয়াটিক সোসাইটি' (১৭৮৪)। লক্ষণীয় যে, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন না করে তাঁরা গতানুগতিক আরবি ফারসী ও সংস্কৃত শিক্ষাকে সীমিত ক্ষেত্রে উৎসাহিত করেন। অতঃপর ১৮০০খ্রীঃ কোম্পানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। এই কলেজ স্থাপনারও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানীর প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে বিদেশী কর্মচারীদের এ দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া। তবে এই কলেজকে কেন্দ্র করেই প্রধানতঃ উইলিয়ম কেরী এবং দেশীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় সৃষ্টি হয়েছে বাংলা এবং উর্দু গদ্য সাহিত্যের যা পরবর্তীকালে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছিল।[৫০]

কোম্পানী শাসনের প্রথম পর্যায়ে সরকারী প্রচেষ্টা না থাকলেও অষ্টাদশ শতক থেকেই এদেশে খ্রীষ্টান মিশনারী সম্প্রদায় ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৭৯৩ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত মিশনারী স্কুলগুলি বিকাশ লাভ করে।[৫১] কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল খ্রীষ্টধর্ম প্রচার।

এই এশিয়াটিক সোসাইটি, মিশনারী প্রচেষ্টা ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ তখন বঙ্গদেশে 'নতুন শিক্ষার আলোকবর্তিকার' ভূমিকা পালন করেছিল।[৫২]

ক্রমে ইংরেজ সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে কিছুটা আগ্রহী হয়েছিলেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সর্বপ্রথম ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা খরচ করার জন্য কোম্পানীকে নির্দেশ দেয়।[৫৩] ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সরকার শিক্ষানীতি নির্ধারণ ও শিক্ষাখাতে বার্ষিক বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের জন্য 'General Committee of Public Instruction' গঠন করেন। ১৮২৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টরস ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান নির্ভর আধুনিক শিক্ষার বিষয়টি অনুমোদন করেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদে কোম্পানীকে বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। শিক্ষাখাতে বরাদ্দ এই টাকা ব্যয়ের নীতি নির্ধারণ করতে গিয়ে মেকলে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তাঁর বিখ্যাত মন্তব্যে (Minute) প্রাচীন পদ্ধতির প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষাদানের তীব্র বিরোধিতা ও নিন্দা করে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের উপর জোর সুপারিশ করেন। মেকলের অভিমত গ্রহণ করে লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ শিক্ষা বাবদে বরাদ্দ সমস্ত অর্থ একমাত্র ইংরেজি শিক্ষার জন্য ব্যয় করার সিদ্ধান্ত সরকারী নীতি হিসেবে গ্রহণ করেন।[৫৪]

মেকলের শিক্ষাবিষয়ক মন্তব্য আপাতদৃষ্টিতে প্রগতিশীল বলে মনে হলেও এর পেছনেও ছিল সংকীর্ণ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সীমিত ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে একটি ইংরেজ ভক্ত সমাজ সৃষ্টি করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করা। তিনি স্পষ্টভাবেই জানিয়েছিলেন —

> আমাদের এখন চেষ্টা করতে হবে এমন একটি শ্রেণী সৃষ্টি করতে যারা হবে আমাদের এবং আমরা যে লক্ষ লক্ষ লোককে শাসন করছি সেই শাসিতদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানকারী। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, ব্যক্তিরা হবে রক্তে, ও রঙে ভারতীয়, আর রুচিতে, মতে, নীতিতে ও বুদ্ধিতে ইংরেজ।[৫৫]

ইংরেজি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানিক সুযোগ অতি সীমিত থাকলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অনেক বাঙালীই ভালো ইংরেজি শিখেছিলেন।[৫৬] বাঙালী হিন্দুর ইংরেজি শিক্ষার আগ্রহের ফলে ১৮১৭ খ্রী. 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া সরকারী আনুকূল্যের উপর নির্ভর না করে দেশী বিদেশী শিক্ষানুরাগীদের সহায়তায়

'স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭) এবং 'স্কুল সোসাইটি' (১৮১৮) স্থাপিত হয়। ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি পাশ্চাত্য সাহিত্য, জ্ঞান বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত প্রভৃতি ব্যবহারিক বিদ্যাচর্চার মাধ্যমে বঙ্গদেশের শিক্ষা-সংস্কার ও শিক্ষান্দোলনের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করে। 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠার পর ইংরেজি শিক্ষা সম্পর্কে জনগণের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং এই ধরণের আরো অনেক প্রতিষ্ঠান দ্রুত গড়ে উঠতে থাকে।[৫৭]

কোম্পানী শাসনের সূচনা থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ দেশে ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সুযোগ প্রধানত হিন্দু সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কেরী, মার্শম্যান, ডেভিড হেয়ার, বেথুন প্রমুখ বিদেশী শিক্ষাব্রতী এবং রামমোহন, রাধাকান্ত, বিদ্যাসাগর প্রমুখ দেশীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিত্বের প্রয়াস ও অবদানে হিন্দুসমাজ লাভবান হয়। ফলে এই কালপর্বে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুসমাজ এগিয়ে যায় এবং তাঁদের মধ্যবিত্ত সমাজের গঠনকার্য প্রায় সম্পন্ন হয় যা আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল।

৩.

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজ পিছিয়ে পড়লেও তাঁরা একেবারে ইংরেজি শিখতেন না তা নয়। এমনকি তখন তাঁদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষাকে কেন্দ্র করে তেমন জটিল আকারও ধারণ করে নি। সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল ফারসীকে রহিত করে ইংরেজি ভাষা প্রবর্তনের সময়। কলকাতা মাদ্রাসায় প্রথমদিকে ইংরেজি চালু করার বিষয়ে মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদ করলেও পরে(১৮২৬ সালে) প্রবর্তিত হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাসায় ৮৭ জন ছাত্র ইংরেজি শিখতো।[৫৮] ১৮২৬ সালে ঢাকার মুসলমানগণ শহরে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্যে হেবসের নিকট আবেদন করেছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবের অজুহাত দেখিয়ে সরকার তা অগ্রাহ্য করেন।[৫৯] মুর্শিদাবাদে মুসলমানদের জন্য প্রতিষ্ঠিত(১৮২৪) 'নিজামত কলেজে' ইংরেজি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল।[৬০] ঐ সময় মিশনারী স্কুলগুলিতে মুসলমান ছাত্ররাও যে পড়ত তার প্রমাণ রয়েছে চুঁচুড়ায় প্রতিষ্ঠিত রবার্ট মে'র স্কুলগুলিতে মুসলমান ছাত্রদের উপস্থিতিতে।[৬১] সোসাইটি পরিচালিত স্কুলসমূহে মুসলমান ছাত্রেরা—হিন্দুর তুলনায় সংখ্যায় কম হলেও পড়াশুনা করত।[৬২] কাজেই ইংরেজি ভাষা ও বিদ্যার প্রতি ঐ সময় তাঁদের একেবারে বিরূপ মনোভাব ছিল না।[৬৩] প্রকৃতপক্ষে যখন চাকুরী প্রভৃতির প্রয়োজনে ইংরেজি শিক্ষা আবশ্যিক রূপে দেখা দিল বা পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়ল তখনই মুসলমান সমাজে নানাবিধ সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল।

মুসলমান সমাজে তখন আশরাফ আতরাফ (উচ্চ নীচ) সামাজিক শ্রেণীভেদ ছিল। আশরাফ বা অভিজাত মুসলমানদের মধ্যে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মতো শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও চর্চা ছিল। পক্ষান্তরে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ আতরাফ বা অনভিজাত মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার বিষয়ে তেমন আগ্রহ ছিল না। গ্রামাঞ্চলে যদিও মক্তব মাদ্রাসায় এরা শিক্ষার্জন করত তবু তা ছিল ধর্মীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ — কোন বৈষয়িক জ্ঞানচর্চার মনোভাব তাঁদের প্রায় ছিল না। সুতরাং তাঁদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ বা বর্জনের প্রশ্নই আসে না। আবার অভিজাত মুসলমানদের একটি অংশও সমাজের পার্থিব ভালমন্দের কথা না ভেবে আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে অধিক নজর দিতেন। যেহেতু ইসলামের ধর্মশাস্ত্র, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি আরবী ফারসীতে লেখা, সেহেতু আরবী ফারসী শিক্ষা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। অবশ্য তখন ফারসী শিক্ষার মানও উন্নত ছিল।[৬৪]

মধ্যযুগের মুসলমান শাসনামল থেকে কোম্পানীর রাজত্বের প্রথমদিক পর্যন্ত ফারসী ছিল সরকারী ভাষা। কাজেই বৈষয়িক উন্নতির পাশাপাশি এই ভাষাটি ক্রমে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের কাছেই সামাজিক মর্যাদালাভের প্রতীকও হয়ে উঠেছিল। কবি ভারতচন্দ্র থেকে শুরু করে রাজা রামমোহন রায় পর্যন্ত অনেক কবি বা মনীষীগণ ফারসী চর্চা করেছিলেন। আর শিক্ষিত ও অভিজাত মুসলমানদের রচিত অধিকাংশ গ্রন্থই ছিল ফারসীতে লেখা। ফলে বিশেষ করে মুসলমান সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারগুলিতে ফারসী মর্যাদা ও প্রতিপত্তির প্রতীক স্বরূপ ছিল। এই রাজভাষা ফারসীর স্থান-চ্যুতিতে মুসলমানরা সাময়িকভাবে ভীষণ আঘাত পান এবং বৈষয়িক সুবিধে হারাবার ফলে তাঁদের এই আঘাত আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং "আইনের দ্বারা একটা ভাষার মুণ্ডচ্ছেদ হলেও যাঁরা এ ভাষাকে ভালবাসেন তাঁরা রাতারাতি এটিকে বিসর্জন দিতে পারেন নি।"[৬৫] ফলে এ সময় তাঁরা যুগোপযোগী শিক্ষাগ্রহণের মানসিক প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু তখন হিন্দু সমাজ যুগের দাবীর সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে ১৮৩৫ সালে যখন ফারসীর বদলে ইংরেজী চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তখন হিন্দুরা তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। বদরুদ্দিন ওমর বলেছেন যে, অগ্রসর হিন্দুদের এই পরিবর্তিত মনোভাবকে পশ্চাদপদ মুসলমান সমাজ ভাল চোখে দেখেন নি। তাঁরা রাজভাষা ফারসীর স্থান-চ্যুতির পেছনে শাসকশ্রেণীর সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তের গোপন ষড়যন্ত্র বলে মনে করেছিলেন।[৬৬] আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রাচ্যদেশীয় শিক্ষার প্রতি মেকলের চরম ঘৃণার মনোভাব।[৬৭] এতে মুসলমানরা স্বাভাবিক কারণে বেশী ক্ষুব্ধ হন এবং নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে থাকবার প্রবণতা আরো প্রবল হয়। সুতরাং ফারসীর স্থান-চ্যুতিতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজই বৈষয়িক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও হিন্দু সমাজ ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে সেই ধাক্কা সামলে নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু মুসলমানরা সেখানে ইংরেজি শিক্ষার অভাবে চাকুরী প্রভৃতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আর্থিক দিক থেকে ভীষন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং সেইসঙ্গে যুগের তুলনায় শিক্ষা ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংরেজি বিমুখতার পেছনে মুসলমানদের জাত্যাভিমান ও ধর্মীয় গোঁড়ামিও যে কার্যকরী হয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না। কারণ এর পশ্চাতে ছিল তাদের 'কয়েক শ বছর ভারত শাসন করার অহমিকা।'[৬৮] "ক্ষমতাচ্যুত মুসলমান সমাজের ইংরেজ-বিদ্বেষ এবং নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে গোঁড়ামি ও গর্ববোধ থাকা তখন স্বাভাবিক" ছিল।[৬৯] কাজেই সে সময় "মুসলমানদের নিকট ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণে সম্মত হওয়ার অর্থ ছিল, তাদের নিজস্ব শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি নতুন বিদেশী ব্যবস্থার নিকট প্রতিরোধহীন আত্মসমর্পণ।"[৭০] আর মুসলমানদের এই প্রতিরোধ আন্দোলনের পেছনে কাজ করেছে ধর্মীয় নেতা শাহ আবদুল আজিজের একটি ফতোয়া (ভারতকে 'দারুল হর্‌ব' অর্থাৎ 'শত্রুর দেশ' বলে ঘোষণা করা) যা সরাসরি ইংরেজি শাসনের বিরুদ্ধে বলা হয়েছিল। অবশ্য তিনি ইংরেজি ভাষার বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। কিন্তু তখনকার এই ইংরেজ শাসন বিরোধিতার কারণে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধেও বিরূপ করে তুলেছিল।[৭১] এর ফলে আশরাফ শ্রেণীর মুসলমানরা ইসলামী সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বের নামে এই ইংরেজি শিক্ষা থেকে দূরে ছিলেন। আবার অন্যদিকে এই বঙ্গদেশে ওয়াহাবী ও ফরায়েজী দুটি ধর্ম ও সমাজ সংস্কার-মূলক আন্দোলনকালে গ্রামের সাধারণ মুসলমানেরা রাজনীতির সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েন। ক্রমে তাঁদের মধ্যে ইংরেজ-শাসন বিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে "ইংরাজী-ভাষা-সংস্কৃতি মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বলে ফতোয়া জারি হয়।"[৭২] গ্রামের মুসলমানদের এই ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিরোধী মনোভাবের

পরিচয় দিতে গিয়ে মীর মশাররফ হোসেন তাঁর 'আমার জীবনী'তে লিখেছেন ঃ

> ইংরেজী পড়িলে পাপ ত আছেই, আর মরিবার সময় গিডিমিডী করিয়া মরিতে হইবে। আল্লাহ রসুলের নাম মুখে আসিবে না। তাহার পরেও আত্মীয় স্বজন গুরুজনগণের ধারণা ও বিশ্বাস যে ইংরেজী পড়িলেই, একরূপ ছোটখাট শয়তান হয়।[৭৩]

তাছাড়া ইংরেজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ায় অনেকে ধর্মহানির আশঙ্কা করেছিলেন।[৭৪] অবশ্য তখন এ আশঙ্কার মূলে খ্রীষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপও অনেকটা দায়ী ছিল।

শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের অনগ্রসরতার একটি প্রধান কারণ হল দারিদ্র্য। সদ্য শাসনক্ষমতা হারানো অভিজাত মুসলিমদের পূর্ব থেকে ভোগ করে আসা সামরিক, রাজস্ব ও বিচার বিভাগের চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল প্রভৃতি নানা কারণে (যা 'অর্থনীতি' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে) মুসলমানরা দারিদ্রবস্থার মধ্যে পতিত হন। সে সময়কার মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে উইলিয়ম হান্টার বলেছেন ঃ

> একশো সত্তর বছর আগে একজন বাঙালী মুসলমানের পক্ষে গরীব হওয়া অসম্ভব ছিল, আর আজ তার পক্ষে ধনী হিসেবে টিকে থাকাই প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৭৫]

এই মুসলমানদের পক্ষে ব্যয়বহুল শহুরে ইংরেজি স্কুলে পড়ানোর মতো সামর্থ্য তখন ছিল না। এ প্রসঙ্গে ডঃ এ. আর. মল্লিকের মতটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ঃ

> The early efforts of the company to educate the people were made in the city of Calcutta where the Hindus predominated. The over-whelming Muslim majority districts of East and North Bengal did not receive the much needed attention of the Government till very late. Another factor was the known poverty of the Muslims which made it impossible for them to educate themselves without adequate help from the Government.[৭৬]

এর উপরে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তৎকালীন ইংরেজ শাসকদের মুসলিম-বিদ্বেষ। সে কারণে ব্রিটিশ সিভিলিয়ান উইলিয়াম হান্টারও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, "বহু ইংরেজ কর্মচারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিরন্তর ঘৃণামিশ্রিত রোষ নিয়ে এদেশে চাকরি করে গেছেন।"[৭৭] মুসলমানদের কাছ থেকে শাসন-ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে হয়েছে বলে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ শাসকদের অবিশ্বাস ও বিদ্বেষভাব ছিল। সে কারণে ইংরেজ শাসকরা হিন্দুদের মত শিক্ষার সুযোগ মুসলমানদের দেননি। বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে বিনয় ঘোষ তাই মন্তব্য করেছেন ঃ

> প্রথমযুগে ব্রিটিশ গর্বমেন্টের নীতি মুসলমান বিদ্বেষ এবং হিন্দু পক্ষপাতিত্বের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাই হিন্দুরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ ও উৎসাহ পেয়েছেন, সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন এবং ইংরেজদের অধীনে কিছু কিছু মোটা বেতনের সরকারী চাকরিও পেয়েছেন। মুসলমানরা সে রকম সুযোগ বা উৎসাহ পাননি।[৭৮]

কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। এই সময় শিক্ষাখাতে বরাদ্দ একলক্ষ টাকা ব্যয় করার ক্ষেত্রে ১৮১৪ সালের ৩রা জুনের ডেসপ্যাচে কোর্ট অব ডিরেক্টর্স যে নির্দেশ দেন তাতে মুসলমানদের স্বার্থ এবং আরবী ফারসী বিদ্যা-শিক্ষা

বা তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয় অথচ হিন্দুদের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষায় উক্ত অর্থ ব্যয় করার জন্য বলা হয়েছিল।[৭৯] ১৮২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত General Committee of Public Instruction ঐ টাকার বেশীর ভাগ বেসরকারী হিন্দু কলেজের জন্যে ব্যয় করেন।[৮০] হিন্দু কলেজে মুসলমানদের কোন প্রবেশাধিকার ছিল না। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ডেসপ্যাচে হিন্দু কলেজে ইংরেজি শিক্ষার জন্য সরকারী অর্থ সাহায্যের কথা বলা হলেও সরকারী প্রতিষ্ঠান কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই হয়নি। সুতরাং তৃতীয় দশকের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগ ছিল মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক এবং ফলভোগী ছিল হিন্দু সম্প্রদায় আর অন্যান্য অঞ্চলের সাধারণ মানুষ বিশেষতঃ মুসলমান সমাজ সে সুবিধে থেকে বঞ্চিত ছিল।

এই সময়ে সরকারী আরো কিছু আদেশের ফলে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অসমবিকাশ বৃদ্ধি পায়। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে থেকে সরকারী কাজে ফারসী ভাষাকে স্থানচ্যুত করে ইংরেজি অথবা আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হওয়ায় ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিরাই সরকারী কাজে সুযোগ সুবিধে লাভ করতে থাকেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দু কলেজে' আইন পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের জন্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা চালু হয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টরের পদ কেবলমাত্র ইংরেজি-জানা ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত হয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সমস্ত আইন পরীক্ষা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে চালু হয় এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কেবলমাত্র আইনের গ্রাজুয়েটরাই মুন্সেফ হবার যোগ্য বলে সিদ্ধান্ত হয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী সিদ্ধান্তে আরো ঘোষণা করা হয় যে, কেবলমাত্র ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পরীক্ষায় সফল হতে পারলেই ভালো সরকারী পদ লাভ করা সম্ভব হবে। আবার মুসলমানদের অর্থে স্থাপিত হুগলী মহসীন কলেজে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল বটে কিন্তু সেখানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রই পড়বার সুযোগ থাকায় হিন্দুদেরই প্রাধান্য ছিল।[৮১] সুতরাং দেখা যাচ্ছে কেবলমাত্র শহুরে এবং ইংরেজি-অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই এই সমস্ত সরকারী ব্যবস্থাপনায় বেশী লাভবান হয়েছেন। মুসলমানরা তখন ইংরেজি শিক্ষায় পিছিয়ে থাকায় তা থেকে আরো বঞ্চিত হয়েছেন। কলকাতা মাদ্রাসায় প্রাথমিক মানের ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হত বটে, কিন্তু তাঁরা কলেজের উচ্চশিক্ষিত প্রতিযোগীদের সঙ্গে তেমন এঁটে উঠতে পারতেন না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলমানদের মধ্যে যোগ্য নেতৃত্বেরও অভাব পরিলক্ষিত হয়। নচেৎ পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে প্রথমদিকে হিন্দুদের মধ্যেও সংস্কার বা বিরোধিতা কম ছিল না। কিন্তু সেক্ষেত্রে হিন্দু সমাজ রাজা রামমোহন রায়ের মতো উদার ও সংস্কারপন্থী নেতার সহযোগিতা তাঁরা পেয়েছেন। মুসলমানদের মধ্যে তখন সে রকম কোন নেতার আবির্ভাব ঘটেনি। সে কারণে তাঁদের ষাটের দশকে নবাব আবদুল লতিফ এবং তার কিছু পরে সৈয়দ আমীর আলীর আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত বাঙালী মুসলমান সমাজে শিক্ষাক্ষেত্রেও চরম বিপর্যয় ও নৈরাশ্যের কাল গেছে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাঙালী মুসলমান সমাজের নতুন যাত্রা শুরু হয়। কেন না সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) পর্যন্ত মুসলমানদের সরকারী বঞ্চনা ও হতাশার দিকটি ছিল প্রবল। সিপাহী বিদ্রোহের পর মুসলমানদের উপর ইংরেজ শাসক যেমন কঠোর দমন পীড়ন করেন তেমনি এর পর থেকে মুসলমানদের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটে। এতদিন ধরে মুসলমানরা তাঁদের সামাজিক ও আর্থিক দুর্গতির জন্য ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করে

আসছিলেন। ইংরেজ শাসক অনুভব করলো, তাদের পশ্চাদপদতার মূলে রয়েছে শিক্ষার অভাব। এছাড়া এ সময় রেভারেণ্ড জেমস লঙ, উইলিয়াম হান্টার প্রভৃতি বিদেশী পণ্ডিতগণও মুসলমানদের পশ্চাদপদতার কারণ ব্যাখ্যা করে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের উন্নয়নের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভাসা ভাসা ভাবে হলেও তখন থেকে মুসলমানদের শিক্ষা প্রসারে সহানুভূতির সঙ্গে অনুধাবন করার মনোভাব ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে লক্ষ করা যায়। ওয়াহাবী ও ফরায়েজী আন্দোলনের স্মৃতির দ্বারা আতঙ্কিত হওয়ার দিন তাদের শেষ হয়। পক্ষান্তরে এই সময়ে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষায় অনগ্রসরতা সম্পর্কে সাধারণভাবে সচেতনতা লক্ষ করা যায়। তাঁরা, বিশেষতঃ সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা উপলব্ধি করেন, এই অনগ্রসরতা কাটাতে হলে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সংঘাতে নয়, তাদের সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমেই সম্ভব।

আধুনিক জীবনের প্রধান সঞ্জীবনী মন্ত্র ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার মধ্য দিয়েই মুসলমান সমাজের নবচেতনা জাগ্রত হয়। পঞ্চাশ বছর আগে হিন্দু সমাজ যা করেছিল, পঞ্চাশ বছর পরে মুসলমান সমাজকে সেই পথ অনুসরণ করতে হল। কলকাতা মাদ্রাসার জুনিয়র স্কলারশিপ পাশ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতিফ (১৮২৮—১৮৯৩) ১৮৬৩ সালে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' স্থাপন করে কলকাতার অভিজাত মুসলমানদের চিন্তার জগতে এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন।[৮২] এর কিছু পরে সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯—১৯২৮) 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৮) প্রতিষ্ঠা করে মুসলমানদের আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের উভয়ের পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকলেও ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনে কোন দ্বিমত ছিল না। তাঁদের স্থির লক্ষ্য ও নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই মুসলিম সমাজের মোহের আবরণ ছিন্ন হয় এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অবাধ আগ্রহ দেখা দেয় ও ইংরেজি চর্চা শুরু হয়। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে লেখা পড়ার চর্চা হিন্দু মুসলমান কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই তেমন ছিল না। সুতরাং তাদের কথা আলাদা। যে অভিজাত মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাচর্চা অব্যাহত ছিল তাদের নতুন মন্ত্রে উজ্জীবিত করার প্রয়োজন ছিল। কারণ, তাঁরাই গোঁড়ামি ও জাত্যাভিমানের কারণে ইংরেজি শিক্ষা থেকে বিমুখ ছিলেন। আবদুল লতিফ ও আমীর আলী জাতির সুপ্ত চেতনাকে জাগিয়ে তুলে ঐ নবমন্ত্রে ডাক দিয়েছেন এবং যথেষ্ট সাড়া পেয়েছেন। গোঁড়া মুসলমানদের সামান্য বাধা থাকলেও তা অতিক্রম করতে তাঁদের তেমন অসুবিধে হয়নি। তাঁদের প্রধান সংগ্রাম করতে হয়েছে সমাজের দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে এবং সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে দাবী আদায়ের মধ্যে। কারণ ততদিনে ব্রিটিশ নীতির ফলেই শিক্ষা দীক্ষা ও চাকরির সমস্ত ক্ষেত্রেই শিক্ষিত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কর্তৃত্ব পুরোপুরি কায়েম হয়ে গিয়েছিল এবং মুসলমানরা হতদরিদ্র হয়ে পিছিয়ে পড়েছিল।

আবদুল লতিফ ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসাগুলিতে আরবী ফারসী শিক্ষা চালু রাখারও পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের বিষয়ে জনচেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ফারসী ভাষায় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার প্রদানের ঘোষনা করেন এবং শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখককে পুরস্কৃতও করেন।[৮৩] ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পরামর্শ অনুসারেই কলকাতা মাদ্রাসায় ইঙ্গ-ফারসী বিভাগ খোলা হয়। কিন্তু কেবলমাত্র জুনিয়র স্কলারশিপ পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়।[৮৪] অতঃপর তিনি মুসলমানদের উচ্চতর ইংরেজি শিক্ষার দাবীতে সরকারের কাছে আন্দোলন করেন। তাঁর এই আন্দোলনের ফলে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ সরকারী খরচে পরিচালিত প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং এখানে হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলমান ছাত্ররাও পড়বার সুযোগ লাভ করে।[৮৫] এ যাবৎ মহসীন ফাণ্ডের টাকা

149649

সর্বসাধারণের শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়ে আসছিল। ফলে হুগলী মহসীন কলেজে হিন্দু ছাত্রদেরই আধিক্য ছিল। অবশ্য যদিও হাজী মহম্মদ মহসীনের উইলে উক্ত টাকা কেবলমাত্র মুসলমানদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে হবে এমন কথা বলা না থাকলেও এ বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে একটা চাপা ক্ষোভ ছিল। আবদুল লতিফ ১৮৬১ সাল থেকে বারে বারে আবেদন করে এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং মহসীন ফাণ্ডের টাকা সাশ্রয় করে ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে নতুন মাদ্রাসা স্থাপন করতে পরামর্শ দেন। অবশেষে ১৮৭৩ সালে সরকার তা কার্যকরী করেন। এইসঙ্গে মুসলমান ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস ও বেশ কিছু বৃত্তিদানেরও ব্যবস্থা হয়।[৮৬] ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার জে.পি. গ্রান্ট আবদুল লতিফকে মুসলমানদের অভিযোগ সম্পর্কে মতামত জানাতে বলেন। সে অনুসারে তিনি একটি প্রবন্ধ (A Minute on the Hoogly Madrassah, Calcutta 26 December, 1861) লিখে বাংলাদেশের মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা প্রকাশ করেন। তিনি এই প্রবন্ধে মুসলমান সমাজে আরবী ফারসীর মর্যাদার কথা ভেবে ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে আরবী-ফারসী শিক্ষারও ব্যবস্থার কথা বলেন। তিনি মুসলমান সমাজকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেন — (১) বিজ্ঞ শ্রেণী (Learned class) এবং অন্যটি বৈষয়িক শ্রেণী (Worldly class)। প্রথম শ্রেণীর মুসলমানেরা ধর্মচর্চায় নিমগ্ন। এঁরা দরিদ্র, সংখ্যায় অল্প কিন্তু সমাজে যথেষ্ট সম্মানিত ও প্রভাবশালী। এঁরা আরবীরই চর্চা করেন — ইংরেজির প্রতি তাঁদের আগ্রহ নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর মুসলমানেরা জাগতিক বিষয়ে বেশী আগ্রহী। সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যবসায়ীরা এই শ্রেণীভুক্ত। তাঁরা ইংরেজি শিখতে আগ্রহী ছিলেন। সে কারণেই তিনি প্রথম শ্রেণীর জন্য আরবী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ইংরেজি ফারসী শিক্ষার পক্ষে সুপারিশ করেন।[৮৭] তাছাড়া তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী প্রণয়নে এবং গ্রন্থ নির্বাচনে মুসলমান সমাজের স্বার্থরক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে হান্টার কমিশনের ভাষাশিক্ষার বিষয়ে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানদের জন্যে যথাক্রমে উর্দু ও বাংলা দুটি পৃথক ভাষা মাধ্যমের পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে সংস্কৃতবহুল বাংলাভাষার সঙ্গে আরবী-ফারসী শব্দযুক্ত করে তাকে মুসলমানীরূপ দেওয়ার কথাও বলেছিলেন[৮৮]।

শিক্ষাক্ষেত্রে আবদুল লতিফের অবদানের গুরুত্ব স্বীকার করেও একটি কথা বলতে হয় যে, তিনি ইংরেজী শিক্ষা ও আরবী-ফারসী শিক্ষার ক্ষেত্রে দোলাচল মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। তৎসত্ত্বেও মুসলমান সমাজে ইংরেজী শিক্ষা বিষয়ে একটা স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে তিনি পেরেছিলেন।

সৈয়দ আমীর আলী ও তাঁর সংগঠন 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন'ও বাংলার মুসলমান সমাজের শিক্ষা প্রসারে এবং নতুন চেতনা সঞ্চারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে তিনি আবদুল লতিফের চেয়ে প্রগতিশীল ও আধুনিক ছিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মার্কুইস অব্ রিপনকে প্রদত্ত 'স্মারকপত্রে' তিনি বলেছিলেন ১৮৩৭ সালেই ফরাসী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে। এ কারণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারসী বা উর্দুর বদলে ইংরেজী মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমেই জাতির পুণর্জাগরণ সম্ভব বলে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল।[৮৯] ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দেই হান্টার কমিশনের কাছে তাঁর এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এক স্মারকলিপিতে হুগলী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর মাদ্রাসাগুলি তুলে দিয়ে কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্যে কলকাতায় একটি ইংরেজী কলেজ স্থাপনের কথা বলা হয়েছিলো। অবশ্য আবদুল লতিফ এ মতের তীব্র বিরোধিতা করেন।[৯০] এ ছাড়া তিনি ও তাঁর এ্যাসোসিয়েশনের গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য বৃত্তিদান এবং বিভিন্ন স্কুল প্রতিষ্ঠার কার্যসূচীর মাধ্যমে

মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারে ও উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে ছিলো। বস্তুত আমীর আলী ও তাঁর সংগঠন শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে জনচেতনা সৃষ্টি ও "আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পাশ্চাত্য শিক্ষার" পক্ষে যাবতীয় প্রয়াস ব্যাপৃত করেছিলেন।

এছাড়া আরও কিছু শিক্ষিত মুসলমান, শিক্ষানুরাগী, জমিদার-জোতদার এই সময় বিভিন্ন সভা-সমিতির মাধ্যমে এবং নানা জায়গায় বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষা আন্দোলনে অংশ নেন। ক্রমে মুসলমান লেখকেরাও বাংলা ও পত্রপত্রিকা ও পুস্তিকার মাধ্যমে প্রচার চালিয়ে একে ব্যাপক আন্দোলনের রূপ দেন।[৯১]

এই সমস্ত উচ্চশিক্ষিত মুসলমান নেতার কর্মপ্রচেষ্টা এবং বিভিন্ন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির সহায়তার সঙ্গে সে সময়কার বাস্তব সুযোগ-সুবিধার আকস্মিক যোগে বাঙালী মুসলমানেরা আধুনিক শিক্ষা লাভ করতে অগ্রসর হল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বাংলাদেশে পাট চাষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ঘটনাক্রমে ১৮৫০ সালে এদেশে প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। ফলে পাটচাষের পরিমাণ বাড়ে ও পাটের দামও বাড়ে। অর্থকরী ফসলের জন্য গ্রামের মুসলমান কৃষকের হাতে নগদ টাকা আসে। ফলে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ঘরের ছেলেরা বিদ্যালয়ে যেতে শুরু করে।[৯২]

কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা আন্দোলন বিফলে যায়নি। উনিশ শতকের সাতের দশক থেকেই এর সুফল ফলতে শুরু করেছিলো।[৯৩] সরকারী শিক্ষানীতির উদারতা, সমাজনেতাদের আন্দোলন, স্বল্পবিত্তদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি প্রভৃতি নানা কারণে মুসলমান সমাজে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা যায়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে বাঙালী-মুসলমান জনসংখ্যার শতকরা ১৪.৭ ভাগ মাত্র স্কুল কলেজে পড়াশুনা করত, সেখানে ১৮৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৩.৮ ভাগে।[৯৪]

ফলস্বরূপ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান সমাজে একটি শিক্ষিত ও সচেতন শ্রেণী গড়ে ওঠে। নবযুগের পদধ্বনি শোনা যায়। ক্রমে এই শিক্ষিত সচেতন শ্রেণীর একাংশ আধুনিক সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে আসেন।

মুসলমান নারীশিক্ষা

এ প্রসঙ্গে উনিশ শতকের মুসলমান নারীদের শিক্ষা সম্পর্কে কিঞ্চিত উল্লেখ না করলে মুসলমান সামাজের শিক্ষার বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তখন মুসলমান নারীদের শিক্ষার অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। ঢাকার নবাব পরিবারের মত বহু মুসলমান পরিবার নারীশিক্ষার পুরোপুরি বিরোধী ছিলেন।[৯৫] তবে অনেক মুসলমান বনেদী পরিবারে গৃহশিক্ষার প্রচলন ছিল। অবশ্য সে শিক্ষা পর্দার অন্তরালে ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরেজি বাংলা শিক্ষা নারীর অন্দর মহলে প্রবেশ করেনি। আবদুল লতিফ শিক্ষার জন্য যা কিছু করেছেন তার সবই ছিল ছেলেদের শিক্ষার জন্য। মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে তার মনোভাব ছিল পুরোপুরি রক্ষণশীল।[৯৬] তিনি এ ক্ষেত্রে যুগধর্ম ও যুগ মানসিকতার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। সৈয়দ আমীর আলীর দৃষ্টিভঙ্গি নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ছিল। তিনি ১৮৯৯ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 'মহামেডান কনফারেন্সের' সভাপতির ভাষণে নারীশিক্ষার সপক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন।[৯৭] কিন্তু তিনিও নারীশিক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য কোন চেষ্টা করেন নি।

মুসলমান নাগরিকের প্রচেষ্টায় ১৮৯৭ সালের ১৯ জানুয়ারী 'মুসলিম বালিকা মাদ্রাসা' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় যা ছিল মুসলমানদের উদ্যোগে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম বালিকা বিদ্যালয়।[৯৯] পরবর্তীকালে কলিকাতায় এসে বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন লেখনীর মাধ্যমে আধুনিক নারীশিক্ষার পক্ষে আন্দোলন করেছিলেন। তারই ফলশ্রুতি তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' (১৯১১)। তবে এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, মফস্বলে নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর অবদান। তিনি গোঁড়া মুসলমানদের বিরূপ সমালোচনা উপেক্ষা করেও নিজ ব্যয়ে কুমিল্লায় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।[১০০] এ ছাড়া এ সময়ে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' (১৯০৩), 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' (১৮৮৩), 'শ্রীহট্ট সম্মিলনী' (১৮৭৬) প্রভৃতি সংগঠনগুলি নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

এ সময় প্রায় সব মুসলমান লেখকই নারী শিক্ষার সমর্থক ছিলেন। তবে প্রথমদিকে এই সব লেখকগণ ও বিভিন্ন সভাসমিতি "পরদার সহিত স্ত্রীশিক্ষা"[১০১] এবং "ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র সম্যকরূপে অধ্যয়ন"[১০২] এর কথাই বলেছেন। এছাড়া তাঁরা নারীর "উচ্চশিক্ষা লাভ করা" কে সমর্থন করেন নি।[১০৩] পরবর্তীকালে তাঁদের এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এমনকি সমকালেও এ নিয়ে বিতর্ক হয়। ফলে অনেকেই নারীর "ইংরেজি শিক্ষার বন্দোবস্তের"[১০৪] কথা যেমন বলেছেন, তেমনি নব্যশিক্ষিত মুসলমানগণ নারীর উচ্চশিক্ষাসহ আধুনিক শিক্ষাদানের উপর জোর দিয়ে মন্তব্য করেন— "যতদিন আমাদের মাতৃসমাজ সুশিক্ষিত হইয়া উপযুক্ত না হইবে, ততদিন আমাদের উন্নতির আশা নাই।"[১০৫]

এইভাবে বাঙালী মুসলমান সমাজ ক্রমে উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে উপলব্ধি করতে শুরু করেন যে সমাজের জাগরণ ও উন্নয়নের সঙ্গে নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তির গভীর যোগ রয়েছে। ফলে দেখা যায়, নারীশিক্ষা সম্পর্কে মুসলমান সমাজের একটা স্থবির অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে গতিশীলতার দিকে অগ্রগমন ঘটেছে। অবশ্য যদিও এই গতিময়তা ছিল মন্থর, তবু তখন নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও সমাজ-মানসিকতায় একটা পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে।

অর্থনীতি

১.

নবাবী আমলে রায়তদের উপরে জমিদারের অত্যাচার ছিল, তবু বাংলার কৃষি ও শিল্পের অবস্থা এতটা ভেঙ্গে পড়ে নি।[১০৬] পলাশীর যুদ্ধের পর ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যের নামে লুণ্ঠন শুরু করে। তাদের সরকারী রাজস্ব সংগ্রহের নীতি, ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য ও দুর্নীতি — উভয় পথেই এই শোষণ শুরু হয়। সংগৃহীত রাজস্বের এক তৃতীয়াংশেরও বেশী অর্থ বিলেতে চলে যেত।[১০৭] ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী দেওয়ানী লাভের পর ক্লাইভের কথা অনুযায়ী "সমস্ত খরচ বাদ দিলেও কোম্পানীর খাঁটি মুনাফা" হয় "অন্তত ১২২ লক্ষ সিক্কা টাকা বা ১৬, ৫০, ৯০০ পাউণ্ড স্টার্লিং।"[১০৮] আবার অন্যদিকে ১৭৫৭ সাল থেকে ১৭৬৬ সালের মধ্যে ইংরেজরা ব্যক্তিগতভাবে এদেশের লোকের কাছে যে ঘুষ আদায় করে, তার একটি অসম্পূর্ণ হিসাবেই পাঁচ কোটি টাকার উল্লেখ পাওয়া যায়।[১০৯]

এইভাবে ইংরেজ বণিকদের নির্লজ্জ শোষণ ও লুঠতরাজ চলতে লাগল। কারুশিল্প ও কুটির শিল্প

> ধ্বংস তো হলই, ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে বাংলার কৃষকের ও কৃষির চরম অবনতি ঘটল।[১১০]

এর ফলস্বরূপ ১৭৭০-৭১ সালে (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে ইতিহাসে কুখ্যাত। কিন্তু তাতেও কোম্পানীর আয় কমে নি বা জুলুম অত্যাচারের মাত্রা হ্রাস পায় নি। দুর্ভিক্ষে প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক মারা যায় এবং চাষবাসের চরম ক্ষতি হয়। তবু দুর্ভিক্ষের পরের বছরে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশি রাজস্ব সংগৃহীত হয়।[১১১] এইভাবে সাধারণ প্রজারা যেমন সর্বস্বান্ত হতে থাকে, তেমনি দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদও ভেঙ্গে পড়ে। অন্যদিকে দুর্ভিক্ষে উচ্চবিত্ত অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাও বিপর্যস্ত হয়।

এদেশে দীর্ঘকাল চাষীর ভূমির উপর ব্যক্তিগত সত্ত্ব ছিল না।[১১২] কিন্তু ইংরেজ আমলে এই পদ্ধতির পরিবর্তন হল। পাঠান ও মোগল রাজত্বকালে যে সব রাজকর্মচারী রাজস্ব বিভাগের কাজ করতেন তাঁরা ক্রমে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী জমিদার হয়ে ওঠেন। কিন্তু মধ্যস্বত্বভোগী সেকালের জমিদারেরা একালের জমিদারদের মত ভূমির স্বত্বাধিকারী হয়ে ওঠেননি। গ্রামের প্রজারাও চাষবাস করবার জন্য উত্তরাধিকারসূত্রে ভূমির স্বত্ব ভোগ করত। কিন্তু এ সবই ছিল প্রথানুগত। বিধিবদ্ধভাবে তা কোথাও লিপিবদ্ধ ছিল না।[১১৩] মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে অতিরিক্ত অর্থলোলুপতার কারণে তাঁরই প্রবর্তিত 'মালজামিনী' ব্যবস্থায় এইসব রাজা ও জমিদারদের পতন ঘটে এবং নতুন রাজস্ব সংগ্রাহক ''ইজারাদার''দের প্রতিপত্তি শুরু হয়। এঁরাই পুরোনো জমিদারদের স্থান দখল-করে ফেলেন এবং 'জমিদার' বা 'রাজা' বা 'মহারাজা' হিসেবে পরিচিত হন।[১১৪]

কোম্পানী রাজস্ব আদায়ে আরো সুষ্ঠু ও নিশ্চিত পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য প্রথমে 'পাঁচসালা' এবং পরে 'দশমালা' বন্দোবস্ত করেন। অবশেষে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করেন। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব বাংলাদেশের আর্থসামাজিক জীবনে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। এর ফলে আবহমান কাল ধরে প্রচলিত এদেশের ভূমি ব্যবস্থার রূপ ও রীতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটল। জমিদার বংশানুক্রমিক ভোগদখলিস্বত্ব লাভ করল। বঙ্গদেশে জমিদারদের পক্ষ থেকে সরকারকে দেয় মোট রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়েছিল, চার কোটি দুই লক্ষ টাকা। কিন্তু বন্দোবস্তের প্রথম বছরেই জমিদারগোষ্ঠী কৃষক প্রজার নিকট থেকে এর প্রায় তিন গুণ খাজনা আদায় করেন। এই অত্যাচার ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১১৫] এর ফলে কৃষকসমাজ ক্রমশ নিঃস্ব ও ভূমিহীন হয়ে পড়ে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে বহু পুরানো জমিদার জমিদারী হারালেন। নতুন অবস্থায় তাঁরাই জমিদারী লাভ করতে পারলেন যাঁদের হাতে নগদ অর্থ মজুদ ছিল। এর ফলে এক শ্রেণীর অনুগত জমিদার সৃষ্টি হয়েছিল যাঁরা পরবর্তীকালে নতুন শাসকের প্রয়োজনসিদ্ধ করেছিলেন।[১১৬]

কোম্পানী এবং বৃটিশ সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাসমূহে এ দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিদেশী কোম্পানীগুলি লাভবান হতে থাকলেও দেশীয় কোম্পানীগুলি মার খেতে থাকে। ব্রিটিশ শিল্পপতিরা ইংল্যাণ্ডের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করে।[১১৭] খুব স্বল্পকালের মধ্যেই এদেশে তিন-চারশ নীলকুঠি গড়ে ওঠে। এছাড়া তারা এখানকার তাঁত শিল্পকেও ধ্বংস করে। ফলে এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল এদেশীয় তাঁতীরা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২.

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই এই বিপর্যস্ত অর্থনীতির মধ্যে পড়ে। কিন্তু মুসলমান সমাজের উপর তার প্রতিক্রিয়া একটু বেশিই হয়। হান্টার বলেছেন, বাংলাদেশে "মুসলমানরাই ব্রিটিশ শাসনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"[১১৯]

প্রাক-ব্রিটিশ পর্বের মুসলমান সমাজকে সাধারণভাবে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ ক. অভিজাত শাসকগোষ্ঠী খ. শাসন-সহায়ক শক্তি ঃ মধ্যস্বত্বভোগী সরকারী বেসরকারী কর্মচারী, জমিদার জোতদার, ছোটখাট ব্যবসায়ী ও কারিগর, এবং গ. বৃত্তিজীবী গ্রামীণ মানুষ ঃ কৃষক, দিনমজুর, জেলে-জোলা, মাঝি-মাল্লা প্রভৃতি।[১২০] এই তিন শ্রেণীর মানুষই ইংরেজ শাসনের অভিঘাতে বিপর্যস্ত হয়।

হান্টার বলেছেন ঃ একজন খান্দানী মুসলমান "সেনাদলে নিয়োগ, খাজনা আদায় এবং বিচার অথবা শাসন বিভাগে চাকরি" থেকে রোজগার করতেন।[১২১]

কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর এঁদের আয়ের উৎস বিনষ্ট হয়। মুসলমান সৈন্যদের পরিবর্তে ইংরেজ সিপাহীরা নিযুক্ত হওয়ায় তাঁরা কর্মচ্যুত হন।[১২২] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে মুসলমান কর্মচারীদের বাদ দিয়ে ইংরেজ কালেক্টর নিয়োগ করা হয়। আগে শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ প্রভৃতি বেসামরিক চাকুরিতে মুসলমানদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। এখন শাসনযন্ত্রে নিযুক্ত মুসলমান আমিল ফৌজদারেরা অধিকার-চ্যুত হন। মুসলিম আইনের প্রাধান্যের কারণে বিচার বিভাগে মুসলিম নিয়োগ অবধারিত ছিল। কাজীর পদটি বংশানুক্রমে পূরণ করা হত। কিন্তু বিচার বিভাগেও মুসলমান ক্ষমতা লুপ্ত হয়। এইভাবে অধিকাংশ দায়িত্বশীল পদগুলিতে মুসলমানদের পূর্বেকার প্রাধান্য দ্রুত খর্ব হতে থাকে।[১২৩] এতে তাদের সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পায় এবং আর্থিক অবস্থারও অবনতি ঘটে।

কোম্পানী শাসনামলের প্রথম পঞ্চাশ বছর সরকারি চাকুরিতে মুসলমানদেরই নিরঙ্কুশ আধিপত্য ছিল।[১২৪] কিন্তু সরকারী কিছু নীতির ফলে এবং ইংরেজ শাসনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে না নেওয়ার কারণে মুসলমানদের অধঃপতন শুরু হয়। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ফলে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজরা বিরূপ হয় এবং ফরায়েজী ও ওয়াহাবী আন্দোলনের ফলে এই বিরূপতা আরো বৃদ্ধি পায়। এতদিন পর্যন্ত সরকারী কাজে ফারসী ভাষারই কদর ছিল। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ফারসীকে তাঁরা আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজীকে সরকারী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হল। বাঙালী হিন্দুরা সহজেই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করলেন। কিন্তু মুসলমানরা স্বধর্ম থেকে পতিত হবার ভয়ে[১২৫] রাজার জাত বলে প্রবল আত্মাভিমানে[১২৬] এবং যুগোপযোগী সচেতনতার অভাবে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা গ্রহণ করলেন না। ফলে মুসলমান রাজত্বের তুলনায় সরকারী চাকুরীতে হিন্দুর সংখ্যা বাড়তে লাগল। কমতে লাগল মুসলমানের সংখ্যা। হান্টার ১৮৭১ সালের এপ্রিল মাসের সিভিল লিস্ট অনুসারে গেজেটেড পদের চাকুরীর যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তাতে বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত মোট ২১১১ জনের মধ্যে ১৩৩৮ জন ইংরেজ, ৬৮১ জন হিন্দু এবং সে ক্ষেত্রে মুসলমানের সংখ্যা ছিল মাত্র ৯২ জন।[১২৭] এমন কি চিকিৎসা ও আইন ব্যবসায়ের মতো স্বাধীন পেশার ক্ষেত্রেও মুসলমানরা পিছিয়ে পড়েন।

ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই হিন্দু-মুসলমানের অসম বিকাশ উনিশ শতকে মুসলমানদের পশ্চাৎ পদতার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

নবাবী আমলে ভূমি-ব্যবস্থায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যে হিন্দুদের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। নবাবেরা জমির ইজারাদার এবং শাসন ব্যবস্থার উচ্চপদে বেশীর ভাগ বাঙালী হিন্দুদেরই নিয়োগ করতেন। কানুনগো বিভাগের সব কর্মচারী, বড় বড় ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কার অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন।[১২৮] ফলে হিন্দুদের একাংশের হাতে প্রচুর অর্থ আগে থেকেই ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার প্রাচীন ও বনেদী হিন্দু-মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত, ক্ষতিগ্রস্ত হলেও হিন্দু সমাজ অনেকাংশে এই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। হান্টার সাহেব মিঃ জেমস ও কিনীলের বক্তব্য উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছেন ঃ

> এ পর্যন্ত যে সব হিন্দু গোমস্তা অত্যন্ত ছোটখাট স্তরের কাজে নিযুক্ত ছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তারা সবাই জমিদার বনে গেল, জমির মালিকানা স্বত্ব লাভ করলো এবং তাদের ঘরে সেই সব ধন দৌলত জমা হতে লাগল, যেগুলি পূর্বে মুসলমানদের আমলাদারীতে তাহাদেরই ঘরে জমায়েত হতো।[১২৯]

এ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান যে মন্তব্য করেছেন তাও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ঃ

> নতুন অবস্থায় তাঁরাই জমিদারী লাভ করতে পারলেন যাঁদের হাতে নগদ অর্থ মজুত ছিল। এই শর্ত পালন করতে পারলেন কেবল নবাবী আমলের হিন্দু রাজস্ব সংগ্রাহকেরা। তাই নতুন জমিদার শ্রেণীতে হিন্দু প্রাধান্যই দেখা যায়। একথা বলা যেতে পারে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে কেন্দ্র করে বাংলার ধনবান হিন্দুরা পুনর্গঠনের যে সুযোগ পেলেন, নগদ অর্থের অভাবে মুসলমানেরা তা থেকে বঞ্চিত হলেন।[১৩০]

এছাড়া কলকাতাবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত, কোম্পানীর দেওয়ান, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দী, দালাল, পোদ্দার, মহাজন প্রভৃতি — যাঁরা ইংরেজের অনুগ্রহ ও সহযোগিতায় প্রচুর বিত্তের অধিকারী হয়েছিলেন, তাঁরা নিলামে অনেক জমিদারী ক্রয় করেন। এইভাবে স্বল্প-সংখ্যক যে জমিদারী মুসলমানদের ছিল তাও প্রায় হাতছাড়া হল। যা অবশিষ্ট ছিল তাও আবার মুসলমানী উত্তরাধিকার আইনের ফলে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ফলে এককালের জমিদার কয়েক পুরুষের ব্যবধানে ভূমি-কৃষকের ভাগ্য বরণ করতে বাধ্য হন।[১৩১] এমনিতে পূর্ব থেকেই বাংলাদেশে বেশীর ভাগ কৃষক ছিলেন মুসলমান।[১৩২] এর ফলে কৃষক মুসলমানের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়।

অন্যদিকে, ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে 'নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইন' -এর বলে বহু 'লাখেরাজ' (নিষ্কর ভূমি) সম্পত্তি মুসলমানদের হাতছাড়া হয়। এই জমিগুলি মুসলমান নবাব বাদশাহগণ তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাবিদ, জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি এবং আশ্রিত ব্যক্তিদের দান করেছিলেন। এই আইনের বলে বহু অভিজাত মুসলমান পরিবার সর্বস্বান্ত হয়।

এইভাবে ব্রিটিশ সরকারের সরকারী নীতি ও শোষণ বুদ্ধির ফলে বাংলাদেশের শুধু অভিজাত মুসলমানরাই ক্ষতিগ্রস্ত হননি সেই সঙ্গে কৃষক - তাঁতি - কারিগর প্রভৃতি বহু গ্রামীণ সাধারণ মানুষও আর্থিকভাবে ক্রমশঃ নিঃস্ব হয়ে গেছেন।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে আর্থিক পশ্চাদপদতার কারণেই মুসলমান সমাজ যেমন আধুনিক নগর সভ্যতার শিক্ষা সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তুলতে পারেননি, তেমনি সমকালের অগ্রসরমান হিন্দু সমাজের সঙ্গে সমতালে এগিয়ে যেতে পারেন নি। বুর্জোয়া অর্থনীতির বিকাশ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের সঙ্গে রেনেসাঁসের একটা সম্পর্ক রচনা করা হয়েছে। বাঙালী মুসলমান সমাজ অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার ফলে এমনই দুর্বল হয়ে পড়ে যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিক্ষায় এবং চাকরিতে বেশি পরিমাণে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। ফলত মুসলমান সমাজে বুর্জোয়া আর্থনীতিক অবস্থার আংশিক বিকাশও ঘটে অনেক দেরিতে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবও বিলম্বিত হয়।

তবে এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ মুসলমান নেতার আন্দোলনের ফলে মুসলমান সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সঞ্চার হয়। সরকারের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। অনেক মুসলমান ক্রমে চাক্‌রি ও ব্যবসার সুযোগ পুনরায় পেতে শুরু করলে তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া এই সময় বাংলাদেশে পাটকল স্থাপনার ফলে পাটচাষ বৃদ্ধি পায়।[১৩৩] মুসলমান কৃষকদের হাতে কিছু অর্থাগম হতে থাকে। এই অর্থাগমের ফলে শহরে গিয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগও তারা গ্রহণ করতে শুরু করে। এই ভাবে ক্রমে অর্থ ও শিক্ষার যুগলবন্দিতে মুসলমান সমাজে বুদ্ধিজীবী তথা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গঠন ও বিকাশের পথ সুগম হয়। তাঁদের মধ্যে নতুন চেতনার সঞ্চার হতে থাকে। সুতরাং আর্থিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মধ্যে চিন্তা-চেতনায়ও মুক্তি আসে। ফলস্বরূপ এই মুসলমান সমাজের আধুনিক সাহিত্যচর্চার দিকেও মনোযোগ লক্ষিত হয়।

রাজনীতি

১.

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজদ্দৌল্লার পরাজয়ের পর থেকেই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গদেশে মুসলমান রাজত্বের অবসান ঘটে। এরপর কিছুদিন ইংরেজরা তাদের বশংবদ ও আজ্ঞাবহ নবাবকে নামেমাত্র ক্ষমতায় রেখে নেপথ্যে শাসকের ভূমিকা পালন করে। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করার পর থেকে এদেশে প্রতক্ষ্যভাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা হয়। অতঃপর ক্লাইভের (১৭২৫-১৭৭৪) বিখ্যাত 'দ্বৈত-শাসন' প্রবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থার কুফল বুঝে কোম্পানী কর্তৃক বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হয়ে আসেন ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৩২-১৮১৮)। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর কালেই ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী নতুন ব্যবস্থায় ভারত শাসনের ব্যবস্থা হয়। ১৮৫৪ সাল থেকে গর্ভনর জেনারেলের (বড়লাট) অধীনে লেফটান্যান্ট গর্ভনরের (ছোটলাট) মাধ্যমে বাংলা-বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের শাসনকার্য পরিচালিত হতে থাকে।[১৩৪] এইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ভারতবর্ষে কোম্পানীর যে অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তার সম্প্রসারণ ঘটে।

প্রথম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ ১৮৫৭ সালের 'সিপাহী বিদ্রোহ' ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ঐতিহাসিকরা একে নানাভাবে দেখেছেন। কেউ একে স্রেফ 'সৈন্যগণের বিদ্রোহ' [১৩৫] কেউ ক্ষয়িষ্ণু মুসলমান সামন্ত শক্তির পুনরুত্থান প্রয়াস,[১৩৬] কেউবা ভারতবাসীর প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম[১৩৭] বলে মনে করেছেন। এর ফলে

কোম্পানী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর প্রথম ক্ষোভের বিষয়টি ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করে। ১৮৫৮ সালের ১ লা নভেম্বর এক ঘোষণাবলে ভারতের শাসনভার কোম্পানীর হাত থেকে সরাসরি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতে চলে যায়। ভারতের জনসাধারণ এরপর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রজাকুলের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু পরবর্তী প্রায় একশ বছরে ব্রিটিশ রাজের শাসন পদ্ধতির মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

এদেশের মানুষের মনে প্রথম থেকেই ব্রিটিশ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিল। মাঝে মধ্যে বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহ বা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এরকম অনেক ছোট বড়ো গণ-সংগ্রাম ও কৃষক বিদোহ বাংলাদেশে সংঘঠিত হয়।[১৩৮] এগুলি হল উত্তরবঙ্গের ফকির ও সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ (১৭৬৭ - ১৮০০), ময়মনসিংহের পাগলাপন্থীদের বিদ্রোহ (১৮৩৩), ওয়াহাবী আন্দোলন (১৮১৮-১৮৭০) ফরায়েজী আন্দোলন (১৮১৮ - ৪৮), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫ - ৫৬), নীলবিদ্রোহ (১৮৫৯ - ১৮৬১), পাবনার প্রজাবিদ্রোহ (১৮৭৩) প্রভৃতি। এই সমস্ত বিদ্রোহের মাধ্যমে ক্রমশঃ এদেশবাসীর মনে স্বাদেশিকতাবোধ ও সামন্ত-বিরোধী মনোভাব অঙ্কুরোদ্গম হতে থাকে। তবে সর্বভারতীয় জাতীয় চেতনাবোধ তখনও গড়ে ওঠেনি।[১৩৯]

২.

উনিশ শতকে বঙ্গদেশে যে জাগরণ ঘটে তার প্রভাব মূলত নাগরিক হিন্দুদের মধ্যেই পড়ে। নানা কারণে মুসলমানরা তার ফল গ্রহণ করতে পারেন নি। ক্রমে হিন্দুদের রাজনীতি ও সমাজনীতিতে যে জাতীয়তাবোধের উদ্দীপন ঘটে তাকে মুসলমানরা হিন্দু জাতীয়তাবাদ বলে মনে করেন। ফলে মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র জাতীয়তা গড়ে উঠল।

সে সময় রাজনৈতিক চেতনাসৃষ্টিতে বিভিন্ন সভা সমিতি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলো।[১৪০] সাহিত্য রচনার মাধ্যমেও দেশাত্মবোধ ও জাতীয় চেতনা সঞ্চারের প্রচেষ্টা হয়। ইংরেজদের আনুগত্য বজায় রেখে জনমতগঠনে নানা প্রতিষ্ঠানেরও জন্ম হয়েছে; যেমন — বেঙ্গল-ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩), ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন (১৮৫১), হিন্দুমেলা (১৮৬৭)। ইন্ডিয়ান লীগ, ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৬), ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন (১৮৮৩) প্রভৃতি। কিন্তু এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে জনসাধারণের যোগ ছিলনা। এই প্রেক্ষাপটে সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষার উদ্দেশ্যে ভূতপূর্ব ইংরেজ সরকারী কর্মচারী অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউমের (১৮২৯ - ১৯১২) উদ্যোগে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। প্রথমদিকে কংগ্রেসের নেতারা প্রকাশ্যে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি মজবুত করার কথা ঘোষণা করেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে সমগ্র বঙ্গদেশে অভূতপূর্ব জনজাগরণের সূচনা হয়। এর ফলে ক্রমেই স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দুর মনে যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয় তার সঙ্গে মিশ্রিত ছিল হিন্দু ঐতিহ্যগর্ব। এমনকি রমেশচন্দ্র মজুমদার "বিদেশী দ্রব্য বর্জনকে হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত করা এবং মন্দিরে দেবমূর্তির সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করা"-র কথা উল্লেখ করেছেন।[১৪১]

৩.

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি মুসলমানদের নির্ভরতা বা আস্থা ছিল না। তারা এই

শাসনের বিরুদ্ধে বিছিন্নভাবে হলেও আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এদের মধ্যে ফরায়েজী (১৮১৮-১৯০৬ খ্রী.) এবং তরিকা-ই-মহম্মদীয়া বা ভারতবর্ষের ওয়াহাবী আন্দোলন (১৮১৮-১৮৭১) গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ মুসলমান সমাজে এই আন্দোলনগুলির গভীর প্রভাব ছিল। ফরায়েজী – ওয়াহাবী আন্দোলন প্রথমে ধর্মীয় আন্দোলন রূপে আরম্ভ হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই তা অর্থনৈতিক - রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। ওয়াহারীরাই সর্বপ্রথম বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ বিতাড়নের জন্য দীর্ঘকাল ব্যাপী এক সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। আর এই ওয়াহাবী আন্দোলনকে মুসলিম কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার অভিপ্রায়ে মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত ভারতবর্ষে প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম বলে উল্লেখ করা হয়।[১৪২] ওয়াহাবী-আন্দোলনের অনুসারী তিতুমীর (১৭৮২ - ১৮৩১) সীমিত আকারে হলেও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করেছিলেন। যেহেতু ইংরেজদের কর্তৃত্বকেই তাঁরা মানেননি তাই ইংরেজদের শাসন-ব্যবস্থা থেকে তাঁরা বিশেষ কোন রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে আত্ম-উন্মোচন করতে পারেন নি।

সিপাহী বিদ্রোহে মুসলমানদের-ই সক্রিয় ভূমিকা বেশী ছিল।[১৪৩] মুসলমান সমাজে এর প্রভাব হয়েছিলো সুদূরপ্রসারী। ফলে তাঁদের উপর ইংরেজ শাসকের দমন, পীড়ন, অত্যাচার, অবিচার নেমে আসে। আগে থেকে চলে আসা ফরায়েজী-ওয়াহাবীদের ইংরেজ-বিরোধিতার কারণে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইংরেজরা মুসলমানদের আরো অবিশ্বাস ও সন্দেহ করতে শুরু করে।

এই সময় মুসলমান সমাজের কিছু অগ্রণী মানুষ অনুভব করেন মুসলমানদের উন্নতির জন্য ইংরেজদের সহায়তা প্রয়োজন। তাঁরা মনে করেন, শুধু বৈরিতা বা অসহযোগিতা নয় — রাজশক্তির সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে বিভিন্ন দাবী আদায়ের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের উন্নয়ন সম্ভব। তাই তাঁরা মুসলমান সমাজে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও সঞ্চারের জন্য বেশ কিছু সভা সমিতি গঠন করেন।[১৪৪] উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) এবং বাংলার আবদুল লতিফ (১৮২৮ - ১৮৯৩) ও সৈয়দ আমীর আলি (১৮৪৯-১৯২৮) প্রমুখ সমাজ-নেতা তাঁদের সংগঠনের মাধ্যমে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

সৈয়দ আহমেদ খান সিপাহী বিদ্রোহের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। তিনি উর্দুতে "আসবাব-এ-বাগাওয়াত - -এ হিন্দ্" নামক গ্রন্থ রচনা করে সরকারের সন্দেহ নিরসনে প্রয়াসী হন। তাঁর আন্দোলনের মূল লক্ষই ছিল শাসক শ্রেণীর সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক লাভ করা এবং দেশের শাসন-ব্যবস্থায় অধিকার অর্জন করা। তিনি ইংরেজ সরকারের বিরাগভাজন হবার আশঙ্কায় রাজনীতিতে মুসলমানদের অংশগ্রহন পছন্দ করেন নি। ১৮৮৮ সালের ১৬ই মার্চ মীরাটের বক্তৃতায় তিনি মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান করতে প্রকাশ্যে নিষেধ করেছিলেন।[১৪৫] অনুমান করা যায়, তাঁরই প্রভাবে বাংলাদেশে নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীও কংগ্রেস বিরোধিতা করেছিলেন।

নবাব আবদুল লতিফ মুসলমান সমাজের উন্নয়নের স্বার্থে ইংরেজের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে চলবার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি ও তাঁর সহযোগীরা প্রথমে 'মহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৫৫) এবং পরে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' (১৮৬৩) নামক সমিতি গঠন করে এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সরকারের প্রতি আনুগত্যের

কারণেই তিনি লর্ড মেয়ো ও জাষ্টিস নরম্যানের হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেন এবং লর্ড মেয়োর হত্যাকারী শের আলীকে মুসলমান সমাজের "a convict villain" বলে অভিহিত করতেও দ্বিধা করেন নি।[১৪৬] ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে 'সোসাইটি'র একটি সভা আহ্বান করে 'তরীকা-ই-মুহম্মদীয়া'র ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের সমালোচনা করেন এবং ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' (শত্রুর দেশ) না বলে 'দারুল ইসলাম' বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সভার প্রধান বক্তা ছিলেন মৌলনা কেরামত আলী জৌনপুরী। এতে ইংরেজদের বিরুদ্ধাচরণ আর ইসলাম-শাস্ত্রানুমোদিত রইল না। ক্রমে এই সিদ্ধান্তটি সারা ভারতে প্রচার লাভ করেছিলো।[১৪৭] এছাড়া সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় তাঁরা ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশন প্রত্যাখ্যান করেন। এমন কি ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে সৈয়দ আমীর আলী সরকারী নীতির সমালোচনা করলে 'লিটারেরী সোসাইটি' এর প্রতিবাদ করে।

সৈয়দ আমীর আলী ও তাঁর সংগঠন 'ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' (পরে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৮) নামে পরিচিত হয়) সৈয়দ আহমদ বা আব্দুল লতিফের মতো ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় ও তাঁর প্রতি আনুগত্যে বিশ্বাসী ছিলেন। তবুও তাঁর কার্যকলাপের মধ্যে রাজনৈতিক প্রয়াস যুগের দাবীর সঙ্গে যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। তিনি এবং তাঁর সংগঠন ইংরেজদের সহায়তায় বিভিন্ন দাবী আদায়ের পাশাপাশি "ধীরে ধীরে পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করা"র[১৪৮]পক্ষপাতী ছিলেন।

সৈয়দ আমীর আলির 'এ্যাসোসিয়েশন' ১৮৮২ সালের ৬ ফ্রেব্রুয়ারী লর্ড রিপনের কাছে একটি দীর্ঘ স্মারকপত্র পেশ করে।[১৪৯] এর মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও যুগ-সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ স্মারকপত্র মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে পরবর্ত্তীকালে সরকারের গৃহীত নীতি সমূহের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। আমীর আলীর এ্যাসোসিয়েশন "সমাজগতভাবে হিন্দু মুসলমানের ঐক্য ও উন্নতি কামনা করলেও রাজনীতিগতভাবে মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য বোধের উন্মেষকেই প্রশ্রয় দিয়েছে"।[১৫০] এ কারণেই তিনি জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করতে অস্বীকার করেন। মুসলমান সমাজে আমীর আলীর এই সংগঠনের প্রভাব বিশেষ কার্যকরী হয়েছিলো ঃ

> এর ফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানেরা 'আঞ্জুমান' গঠিত করে চলে। এইসব আঞ্জুমানের বা সম্মেলনের বড়ো লক্ষ হয় মুসলমানদের মধ্যে সংহতি স্থাপন করা —— ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র সব ব্যাপারেই মুসলমানদের আশা আকাঙ্খা সংহত ও সুস্পষ্ট হোক এই হল এর লক্ষ্য।[১৫১]

'জাতীয় কংগ্রেসে' যোগদানের বিষয়ে মুসলমান সমাজের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সন্দেহ, দ্বিধা ও টানাপোড়েন ছিল। কংগ্রেসে কেবলমাত্র হিন্দুদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয় — এই অভিযোগ তুলে মুসলমানেরা এতে যোগদানে বিরত থাকেন।[১৫২] দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া জোরালো হওয়ার কারণে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি সরকার বিরূপ হয়ে ওঠে।[১৫৩] মুসলমানেরা ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপের ফলে পূর্ব থেকে এমনিতেই ইংরেজের বিরাগভাজন হয়ে উঠেছিলেন এবং নানা সরকারী সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। তাই তাঁরা আর পুনরায় কংগ্রেসের সরকার বিরোধী মনোভাবে সায় দিতে পারেন নি। তখনকার বাংলার গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন মুসলিম সভা-সমিতি ও পত্র-পত্রিকায় তাঁদের এই মনোভাবের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।[১৫৪]

অবশ্য মুসলমানদের একাংশ কংগ্রেসে যোগদানের পক্ষেও মত পোষণ করেছিলেন। বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতা বদরুদ্দীন তৈয়েবজী (১৮৪৪ - ১৯০৬), পণ্ডিত শিবলী নোমানী (১৮৫৭ - ১৯১৪) সহ বাংলাদেশের বর্দ্ধমানের আবুল কাশেম, দেলদুয়ারের আবদুল হালিম গজনবী, পাবনার ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাহিত্যিকগণ, ঢাকার 'আঞ্জুমানে ইসলাম'-এর মত সংগঠন ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত 'সোলতান' প্রভৃতি কিছু পত্র-পত্রিকা কংগ্রেসে যোগদানের সপক্ষে মত পোষণ করেন।

এর থেকে বোঝা যায়, মুসলমানদের মধ্যে ক্রমে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত হয় এবং রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁদের একাংশের কংগ্রেস-সমর্থন সত্ত্বেও অধিকাংশের মনোভাব ছিলো ইংরেজদের প্রতি অনুগত। এই ইংরেজ সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করে মুসলিম সমাজ-নেতারা স্বসমাজের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের পথ উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। এর আশুফল হয়েছিলো ইংরেজি শিক্ষালাভে আগ্রহবৃদ্ধি এবং পাশ্চাত্য প্রভাবে মুসলমান সমাজের উন্নতির পথ প্রশস্ত করা।

উনিশ শতকের শেষে বিশ শতকের প্রথম দশকে বাঙালী মুসলিম মানসে একই সঙ্গে ইসলামীয় ঐক্য ও ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য রক্ষার মনোভাব বজায় ছিল। এই সময়ে নানা কারণে ক্রমশঃ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেকার সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। অগ্রগামী হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব থেকে মুসলমান সমাজ স্বার্থ-সংরক্ষণে আরো বেশি সচেতন হয়ে উঠেছেন। এমতাবস্থায় বাংলাদেশে বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) সংঘটিত হলে এর প্রতিবাদে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হয়। মুসলমানেরা স্বদেশী আন্দোলনের বিষয়েও দ্বিধাবিভক্ত ছিলেন। একটি অংশ[১৫৫] এই আন্দোলনকে সমর্থন করলেও অধিকাংশ মুসলমান এর বিরোধিতা করেছিলেন।[১৫৬] সেই সময় মুসলমান সমাজের উপর ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ, ময়মনসিংহের সৈয়দ নওয়াব আলি চৌধুরী এবং কলকাতার নবাব সৈয়দ আমীর হোসেনের ব্যাপক প্রভাব ছিল। ব্রিটিশ সরকার মুসলিম নেতৃবৃন্দের কাছে মুসলমান সমাজের সুযোগ-সুবিধের কথা তুলে ধরলে তাঁরা বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করেন। তাঁরা উপলব্ধি করেন শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে পড়া মুসলমানরা পূর্ববঙ্গে আত্মনিয়ন্ত্রের অধিকার পাবে এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ পাবে। অন্যদিকে, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে 'হিন্দু-ঐতিহ্য' গর্ব যুক্ত থাকায় মুসলিম-মানসকে এর বিরোধী করে তুলেছিলো। তাছাড়া, ক্ষুদ্র মুসলমান ব্যবসায়ীদের উপর স্বদেশীদের 'অমানুষিক জোরজুলুম ও অত্যাচার'-এর কারণে অনেক মুসলমান বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করলেও বয়কট বা বিদেশীদ্রব্য বর্জন কার্যকলাপকে সমর্থন করতে পারেন নি।[১৫৭]

বঙ্গভঙ্গের এই প্রেক্ষাপটে হিন্দু মুসলিম পরস্পর অনেকটা বিছিন্ন হয়ে পড়ে। ইংরেজদের ঈপ্সিত হিন্দু মুসলিম ভেদনীতি[১৫৮]—র ফলে এই বিছিন্নতা আরো বৃদ্ধি পায়। এই পটভূমিকায় মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভূত হয়। হিন্দু-প্রাধান্য থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে মুসলমানদের একটি প্রতিনিধি দল সিমলায় ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইংরেজরা তখন হিন্দু-কংগ্রেসের ক্রমাগত প্রাধান্যে ও আন্দোলনে আতঙ্কিত ছিলেন। তাই তাঁরা চেয়েছিলেন 'a possible counter-poise to congress aims'।[১৫৯] সিমলা ডেপুটেশনের সূত্র ধরে ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর 'সারা ভারত মুসলিম লীগ' গঠিত হয় যা ভারতের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রতিষ্ঠাকালে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে এবং অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি সম্প্রীতি রক্ষা করে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থরক্ষা করাই ছিল লীগের

প্রধান উদ্দেশ্য।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে নানা ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মুসলমান সমাজে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগতে থাকে। ক্রমশ বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে সীমিত রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার হয়। অবশ্য এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। মূলতঃ মুসলমান স্বার্থরক্ষা ও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রেই এই চেতনা দেখা দিতে থাকে। অবশেষে 'মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে "বাঙালী মুসলিম সমাজে জাতিগত স্বাতন্ত্র্য চিন্তা ও সম্প্রদায়গত স্বার্থ সংরক্ষণের ঝোঁক বিশেষ প্রশ্রয় লাভ করে এবং সমাজ-রাজনীতিতে এর সুদূর প্রসারী প্রভাব মুদ্রিত হয়"।[১৬০] নব জাগরণের অন্যতন প্রধান শর্ত হল, "রাজনৈতিক চেতনার উদ্বোধন"।[১৬১] উনিশ শতকের শেষার্ধে মুসলমান সমাজে সীমিত আকারে হলেও এই রাজনৈতিক চেতনা দেখা দেয়। ফলে তাঁদের আধুনিক চিন্তা-চেতনার স্বাক্ষর মুদ্রিত হতে থাকে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের লেখনীতে। তাঁদের এই চেতনা ও প্রয়াস থেকে চিত্তোৎকর্ষের উদ্বোধন হয়। নতুন সাহিত্য রচনার পথও সুগম হয়ে ওঠে।

সমাজ

বাংলাদেশে মুসলমান সমাজের পত্তন ও বিকাশ দীর্ঘ-ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সম্পাদিত হয়েছে। শাসক, সৈনিক, বণিক, ধর্মপ্রচারক প্রভৃতি বহিরাগত মুসলমান, ধর্মান্তরিত স্থানীয় জনসাধারণ এবং বৈবাহিক সূত্রে জাত মিশ্র রক্তধারার মানুষ—এই ত্রিবিধ পদ্ধতিতে বাংলায় মুসলমান সমাজের গঠন ও পরিবর্ধনের কাজ সারা মধ্যযুগ ধরে চলেছিল।[১৬২] ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এসে এই মুসলমান সমাজের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে সমগ্র বাংলাদেশে একটি সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁদের মধ্যে ধীরে ধীরে সচেতনতা দেখা দেয়। সুতরাং এই সময়ে মুসলমান সমাজ নানা ভাব-সংঘাত ও সমস্যা-দীর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে কাল অতিবাহিত করেছে।

উনিশ শতকে জাতিতত্ত্বের আলোচনা বাঙালী মুসলমান সমাজকে যথেষ্ট সচেতন ও সক্রিয় করে তোলে। বঙ্গদেশে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাই ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে বলে গ্রিয়ারসন, হাণ্টার, ডাল্টন, ব্লুক, জেমস ওয়াইজ, হার্বার্ট রিজলি প্রমুখ ইংরেজ পণ্ডিতগণ অভিমত পোষণ করলে[১৬৩] আভিজাত্যগর্বী মুসলমানদের অনেকেই এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন। মুর্শিদাবাদ এস্টেটের দেওয়ান খোন্দকার ফজলে রাব্বির এই মত খণ্ডন করে 'হাকিকত-ই মুসলমানানে বাঙ্গালাহ' নামক (১৮৯১) ফারসী-গ্রন্থে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, বাংলার অধিকাংশ মুসলমানই বিদেশাগত অভিজাত শ্রেণীর লোক। ফজলে রাব্বির এই মত ষোল আনা সত্য না হলেও সেকালের মুসলমান সমাজের একাংশের মনোভাব এতে প্রতিফলিত হয়েছিল। জাতিতত্ত্ব নিয়ে এই তর্ক-বিতর্ক অভিজাত ও শিক্ষিত মুসলমানদের 'স্বতন্ত্র অস্তিত্ব' ও 'বংশ-কৌলিণ্য' সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।[১৬৪]

ইসলাম ধর্মে জাতিভেদ বা বর্ণ-বৈষম্য না থাকলেও বাংলাদেশে হিন্দু জাতিভেদ বা বর্ণাশ্রম প্রথার প্রভাবে বা সাদৃশ্যে মুসলমান সমাজেও জাতিভেদ দেখা দেয়। সামাজিক বিন্যাসের দিক থেকে রুবেন লেভী-এই মুসলমান সমাজের তিন শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন– (১) আশরফ বা অভিজাত, (২) আতরাফ/আজলাফ বা অনভিজাত মুসলমান

এবং (৩) আরজাল বা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণী।[১৬৫] সৈয়দ, শেখ, মোঘল ও পাঠান-এই চার শ্রেণীর বিদেশাগত মুসলমান এবং এদেশীয় উচ্চ বর্ণের ধর্মান্তরিত হিন্দুগণ নিজেদের আশরাফ বলে পরিচয় দিতেন। এঁরা বেশীর ভাগ রাজপদ অলঙ্কৃত করতেন এবং বংশ-মর্যাদায় ও শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রণী ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ আতরাফগণ 'রযীল' বা 'ইতর' নামেও পরিচিত ছিলেন। দৈহিক শ্রমের উপর এদের পেশা নির্ভর করত। কৃষক, দর্জি জোলা, বারহি, ধুনিয়া, কসাই, কলু, নিকারী, বেদিয়া, হাজ্জাম, তুতিয়া প্রভৃতি পেশাজীবীগণ এই শ্রেণীর। তৃতীয়তঃ যাঁরা একেবারে নিম্নস্তরের পেশায় নিযুক্ত ছিলেন তাদের বলা হত আরজাল। হালালখোর, হিজড়া, কসবি, মেহতব, মাঙ্গতা, লালবেগী প্রভৃতি এই শ্রেণীর মুসলমান। এরা দরিদ্র এবং এদের মধ্যে লেখা পড়ার চর্চা ছিলনা। এই শ্রেণীর লোকেদের মসজিদে প্রবেশ করতে এবং সাধারণ গোরস্থানে মৃতদেহ দাফন (কবরস্থ) করতেও দেওয়া হত না।[১৬৬] ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এই শ্রেণী-ভেদ এবং আভিজাত্য-বোধ প্রবল ছিল বলে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে বা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে আশরাফগণ আতরাফ ও আরজালদের সঙ্গ এড়িয়ে চলতেন। আর এইভাবে তখন বাঙালী মুসলমানগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাতে মুসলমান সমাজের সমগ্র অংশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

উনিশ শতকে বাঙালী-মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এই আশরাফ শ্রেণীরাই সমাজের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসনামলে নানা কারণে এরা এক আভিজাত্য গর্বী, অতীতাশ্রয়ী দরিদ্র শ্রেণীতে পরিণত হন। ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণেও তাঁরা আগ্রহী ছিলেন না। বাংলাভাষা ও সংস্কৃতিকেও তারা অবজ্ঞা করেছেন। সাধারণ অনভিজাত মুসলমানদের সঙ্গে তাদের সামাজিক যোগসূত্র হীনতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক দূরত্বও বজায় ছিল। পরবর্তীকালে মুসলিম সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্বিভাবের ফলে এই দূরত্ব ঘুচে গিয়ে অনেকটা কাছাকাছি আসে।

তবে হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথার মতো মুসলমান সমাজে এই শ্রেণীভেদ অলঙ্ঘনীয় ছিল না। ধর্মের কোন বিধিনিষেধ ছিলনা বলে বিত্ত ও বিদ্যার জোরে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানরা উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হবার সুযোগ সহজেই লাভ করতে পারতেন। সে কারণে এ সম্পর্কে একটি প্রবাদ বেশ চালু ছিল ঃ

> গত বছর আমি একজন জোলা ছিলাম, এ বছর আমি একজন 'শেখ', আগামী-বছরে ফসলের দাম ভাল পেলে আমি একজন 'সৈয়দ' হব।[১৬৭]

এইভাবে মুসলমান সমাজ একদিকে উচু-নিচু ভেদাভেদের কারণে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে স্থবির সমাজে পরিণত হয়েছিল এবং সার্বিক ভাবে প্রথমদিকে আধুনিক চিন্তা-চেতনার বদলে সঙ্কীর্ণ ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হয়েছিল। ফলে তাঁরা যুগের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছিল।

উনিশ-শতকে মুসলমান সমাজে আশরাফ-আতরাফ্ শ্রেণীভেদের দ্বন্দ্ব ছাড়াও শিয়া-সুন্নী, মজহাবী-লা-মজহাবী, শরীয়তপন্থী-মারিফতপন্থী, পীরপন্থী ও পীর-বিরোধী প্রভৃতি ধর্মীয় সমাজগোষ্ঠীর অন্তর্কলহও তখন বজায় ছিল।[১৬৮]

অন্যদিকে বহির্দ্বন্দ্বে আপন অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন বাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর হিন্দুসমাজের বিরোধও উভয় সমাজকে আন্দোলিত করেছিল। আর এই পারস্পরিক দ্বেষ-বহ্নিতে ইন্ধন যুগিয়েছিল বিদেশীশাসক

ইংরেজরা। বাংলাদেশে এই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ মুসলমান সমাজে সুদুর প্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। অবশ্য হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সংঘাতের সম্পর্ক মধ্যযুগ থেকেই চলে আসছিল। উনিশ শতকে উভয় সম্প্রদায়ের অসমবিকাশের ফলে ক্রমে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং নানা বিভেদজনিত কারণে দুরত্বটি আরো বেড়ে ওঠে।

উনিশ শতকে এমনিতেই মুসলমান জমিদারের সংখ্যা অনেক কমে এসেছিল। তবু যে ক'জন জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর মুসলমান ছিলেন তাদের অশিক্ষা, অকর্মণ্যতা, বিলাসিতা ও সমাজ-উন্নয়ন সম্পর্কে ঔদাসীন্য মুসলমান সমাজের অগ্রগতিকে আরো বিলম্বিত করেছিল। এ সময়কার জমিদার শ্রেণীর বিত্তবানদের একটি চিত্র সেখ আবদোস সোবহান তাঁর 'হিন্দু মোসলমান' (১৮৮৮) গ্রন্থে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন ঃ

> বাইজী, খেমটাঅলি, তরফদার, যাঁহার বিলাসীতার অঙ্গ, এসব আমোদে যিনি অহো রাত্রি মগ্ন। কবুতর উড়ান, মোরগবাজি, ঘুড্ডি খেলা, সৎরঞ্চ খেলা, যাহার প্রিয়কার্য– পারসির এক দস্তখত পর্য্যন্ত যাঁহার দৌড়, যিনি সমুদয় দিন, কি অন্ততঃ দিনের ১০ ঘটিকা পর্যন্ত গড়িয়ে গড়িয়ে নিদ্রা যান, সেই 'চৈতন্য জড় পদার্থ'[১৬৯] ই

—বাঙালী মুসলমান জমিদার। আর "অশিক্ষিত মূর্খ, মদ্যপায়ী, বিলাসী, লম্পট, মোসাহেব ইয়ার"-ই[১৭০] ছিল এঁদের সঙ্গী। সুতরাং এদের দ্বারা কোন মহৎ কার্য সাধিত হয়নি।

পশ্চাদপদ মুসলমান সমাজের নারীদের অবস্থা আরো শোচনীয় ছিল তা বলাই বাহুল্য। কেননা তাঁরা সীমিত ক্ষেত্রে অন্তঃপুরে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করবার সুযোগ পেলেও আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় প্রায় বঞ্চিত ছিলেন। পর্দা ও অবরোধপ্রথার কারণে তাঁরা বহির্জগতের শিক্ষালাভে বঞ্চিত ছিলেন বলে নারীমুক্তিও আসেনি। মুসলমান সমাজে হিন্দুসমাজের গৌরীদান প্রথার মতো বাল্যবিবাহ বা বিধবাবিবাহ কোন ধর্মগত সংস্কার ছিলনা। হজরত মোহম্মদ (সঃ) একাধিক বিধবাকে বিবাহ করেছিলেন। তবু এই দুটি সংস্কার ভারতীয় হিন্দু সমাজের প্রভাবে মুসলমান সমাজেও উনিশ শতকে সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। এই সময়ে বিধবা-বিবাহকে অনেক মুসলমান অবজ্ঞা করেছেন। ফলে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ঐ সময় বাংলার মুসলিম পরিবারে ৪ থেকে ২৯ বছর পর্যন্ত বিধবার সংখ্যা ছিল ১৭, ২১, ৩৯০ জন।[১৭১] বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে চারটি পর্যন্ত বিবাহের অনুমোদন ইসলাম ধর্মে রয়েছে।[১৭২] এর সুযোগ নিয়ে মুসলমান পুরুষেরা একাধিক বিবাহ ও তালাকের ক্ষেত্রে যথেচ্ছ স্বেচ্ছাচারিতা করতেন বলে মুসলিম নারীদের জীবন অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। এছাড়া ছিল দাসী বাঁদী প্রথা। সুতরাং নারীদের এইসব বহুবিধ সমস্যার ফলে সমগ্র মুসলমান সমাজকে আরো কিছুদিন অচলায়তনের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল।

বাংলাদেশে ইংরেজ আগমনের ফলে আধুনিকতার সূচনা হয়। পুরোনো সমাজ-কাঠামো ভেঙ্গে গড়ে ওঠে নতুন শ্রেণী ও সমাজ। পূর্বে এদেশের গ্রাম সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল আত্মনির্ভরতা ও স্বয়ং সম্পূর্ণতা।[১৭৩] ইংরেজ-শাসন আমাদের গ্রাম সমাজের এই স্বয়ং সম্পূর্ণতা ও বিচ্ছিন্নতাকে নষ্ট করে পারস্পরিক যোগসূত্র তৈরী করে দেয় এবং মানুষ শহরমুখী হয়ে ওঠে। জমির পরিবর্তে মুদ্রা হয়ে ওঠে সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের মাপকাঠি। গ্রাম ও শহরে নতুন সামাজিক বিন্যাস দেখা দেয়। একদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে গ্রামীণ বাংলায় জমিদার ও রায়ত শ্রেণীর

পাশাপাশি জন্ম নেয় জোতদার, মহাজন, ক্ষেতমজুর ও ব্যবসায়ী শ্রেণী; অন্যদিকে শহরাঞ্চলে দেখা দেয়—শিল্পপতি বণিক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, আইনজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক, কেরাণী, কুলি, মজুর প্রভৃতি পেশাজীবী শ্রেণী।[১৭৪]

সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে এঁদের বলা হল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। অবশ্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে কোন পৃথক শ্রেণীর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। ধনতান্ত্রিক সমাজে বিত্তবান পুঁজিপতিরা হলেন উচুতলার আর শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ নীচু তলার। এর মাঝের শ্রেণীই মধ্যবিত্ত। সমালোচকের ভাষায় ঃ

> . . . the middle class includes within its ranks the middling size enterpreneur in industry and trade; the simple producer of goods, such as the artisan and farmer; the small shopkeeper and trademan ; and the official and salaried employee. [১৭৫]

প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে প্রশাসন, ভূমি ও ব্যবসায় কেন্দ্রিক মধ্যস্বত্বভোগীর অস্তিত্ব ছিল ঠিকই, কিন্তু তারা শ্রেণীস্বার্থ সম্বন্ধে তেমন সচেতন ছিল না। তখনকার দিনে ছিল এক দরবার সংস্কৃতি এবং অন্যদিকে লোক সংস্কৃতি। মধ্যবিত্তের নিজস্ব কোন সংস্কৃতি ছিল না। আধুনিক নগর-কেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশের মূলে রয়েছে যন্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য। ইংরেজ সরকারের মাধ্যমেই ক্রমশঃ কলকাতায় মধ্যবিত্তের পত্তন হয়। কলকাতায় বিভিন্ন দপ্তরে ভাগ্যান্বেষীর দল ভিড় জমিয়ে কালে যে সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলে তাকেই শহরকেন্দ্রিক শ্রেণীসচেতন আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলা হয়েছে।[১৭৬] আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক বিনয় ঘোষ জানিয়েছেন ঃ

> বাংলাদেশে নতুন শ্রেণী রূপায়ণের ফলে সমাজে যে শ্রেণীর বিস্তার হয়েছে সবচেয়ে বেশী এবং অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় যার আধিপত্যও ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে, তা হল মধ্যবিত্ত শ্রেণী।[১৭৭]

এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই বাংলার ভাব-বিপ্লবের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এঁরাই শহরকেন্দ্রিক আধুনিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। তবে বঙ্গদেশে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে সমভাবে মধ্যবিত্তের বিকাশ হয়নি।

উনিশ শতকের প্রারম্ভকাল থেকেই হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের গঠন ও বিকাশের কাজ শুরু হয়। কিন্তু মুসলমান সমাজে আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃজন ও বিকাশের সূচনা হতে বিলম্বিত হয়। তবে বিলম্বে হলেও বাঙালী মুসলমানরাও আধুনিক জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করেছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশেষতঃ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আবদুল লতিফের 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটী' এবং এর কিছু পরে সৈয়দ আমীর আলীর 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৮) প্রভৃতি সংগঠনের মাধ্যমে মুসলমান সমাজে আন্দোলন শুরু হয়। পূর্বেকার গোঁড়ামি ও ইংরেজ-বিরূপতা দূর হয়ে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষায় তাঁরা আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এছাড়া পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অগ্রসর হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের ক্রমবর্ধমান দাবী ও আন্দোলনের কারণে তাঁদের বিপক্ষে 'সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি'র ভিত্তিতে শাসনকার্য চালনার সুবিধার্থে মুসলমানদেরও ইংরেজ শাসক এরপর থেকে আনুকূল্য করেন। ফলে শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে সীমিত আকারে হলেও কিছুটা সুযোগ-সুবিধে লাভের কারণে মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠতে থাকে।

তাঁরাও ক্রমশ আধুনিক জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। নূতনভাবে অনেক কিছু বিচার-বিশ্লেষণ শুরু করেন। একদিকে তাঁরা যেমন স্বসমাজের অনেক অনাচারের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা শুরু করেন, অন্যদিকে তেমনি হিন্দুমধ্যবিত্তের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আত্মপ্রকাশ লাভ করেন।

ইতিপূর্বে যে সমাজের নেতৃত্ব ছিল কেবল উচ্চশ্রেণী ও বিত্তবানদের হাতে তা ক্রমশঃ সচেতন ও ক্রমবিকাশমান এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে পরিচালিত হতে লাগল। এরপর নবমূল্যায়ণের সময় মুসলমান সমাজে পূর্বেকার আশরাফ-আতরাফ প্রভৃতি জাতিভেদের নিন্দা করা হতে লাগল। তাঁরা একে শরীয়তবিরোধী বলে চিহ্নিত করেন। এই জাতিভেদ সমাজে প্রাচীর রচনা করে এর গতি রুদ্ধ করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন এবং এর বিলোপ-সাধনের জন্যে মসীচালনা শুরু করেন।[১৭৮] পর্দা ও অবরোধ প্রথা সমাজে নারীমুক্তির ও উন্নতির অন্তরায় এরূপ চেতনা থেকে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, তালাকপ্রথা ও বাঁদীপ্রথা প্রভৃতি প্রথার ক্ষেত্রে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে মুসলমান সমাজে যে অনাচার উনিশ শতকে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে এই সচেতন শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা নানাভাবে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। সর্বোপরি মুসলমান সমাজের পশ্চাদপদতা ও তার উন্নয়নের উপায়-চিন্তা নিয়ে এই অংশ নতুনভাবে ভাবনা চিন্তা শুরু করেন। এসব করতে গিয়ে তাঁরা নানা প্রতিষ্ঠান, সভাসমিতি ও পত্রপত্রিকার আশ্রয় নিয়ে প্রচার চালিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা সামাজিকভাবে যথেষ্ট সচেতন হয়ে ওঠেন। আবার সামাজিক সমস্যা ও আপন ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা বাংলা না উর্দু হবে তা নিয়েও মুসলমান সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এ ছাড়া সমকালে হিন্দু লেখক সাহিত্যিকদের দ্বারা মুসলমান সমাজ ও ঐতিহাসিক চরিত্রকে বিকৃতকরে অঙ্কিত করা হয়েছে- — এরূপ অভিযোগ করে মুসলমান লেখকরাও এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ লেখনী চালনা করেন।[১৭৯]

এইভাবে দেখা যায়, শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃজন ও ক্রমবিকাশের ফলে উনিশ শতকের শেষার্ধে মুসলমান সমাজে নানা বিষয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং নতুন চেতনার সঞ্চার হয়। ক্রমপরিবর্তনমুখী এই মুসলমান সমাজ শিক্ষা সচেতন হয়ে ওঠেন এবং সমাজের উন্নতির জন্য নানা ভাবনা চিন্তা শুরু করেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্বিভাব ঘটলে আধুনিক সাহিত্যচর্চার প্রবণতাও তৈরি হয়।

তথ্যসূত্র

১. আবুল আহসান চৌধুরী, 'মীর মশাররফ হোসেন', ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ৫২

২. ঐ , পৃ. ৫৭

৩. শেখ আবদুর রহিম গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, "বঙ্গভাষা ও মুসলমান সমাজ", ঢাকা, বৈশাখ, ১৩৭৪, পৃ. ২১৯
উল্লেখ, আবুল আহসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫

৪. সুশোভন সরকার, 'বাংলার রেনেসাঁস' , কলকাতা, দীপায়ন, কার্তিক ১৩৯৭, পৃ. ১০-১১

৫. ঐ, পৃ. ১০

৬. Alfred Von Martin, "Sociology of the Renaissance", London, 1945, P-3
উদ্ধৃত, বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি, কলকাতা, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ২য় সং, আষাঢ় ১৩৯১, পৃ. ১৬৮

৭. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮

৮. সুশোভন সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

৯. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

১০. ঐ , পৃ. ২১-২২

১১ ঐ , পৃ. ২৬

১২, ঐ , পৃ. ১৩৫

১৩. ঐ , পৃ. ১৩৫

১৪. ঐ , পৃ. ১৬৯

১৫. ঐ , পৃ. ১৮৪

১৬. অমলেশ ত্রিপাঠী, 'ইতালীর র‍্যনেসাঁস, বাঙালীর সংস্কৃতি', ২য় পরিবর্ধিত সং, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৬, পৃ. ৫০

১৭. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩

১৮. অমলেশ ত্রিপাঠী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

১৯. ঐ , পৃ. ৩৬

২০. ঐ , পৃ. ৩৭

২১. ঐ , পৃ. ৩৮

২২. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪

২৩. অমলেশ ত্রিপাঠী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

২৪. সুশোভন সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫-৮৬

২৫. গোপাল হালদার, "রামমোহন পর্ব ও রামমোহন রায়", পশ্চিমবঙ্গ-রামমোহন সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৩, পৃ. ৮৩

২৬. বিপিনচন্দ্র পাল, "যুগ-প্রবর্তক রামমোহন" পশ্চিমবঙ্গ-রামমোহন সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

২৭. Bipan chandra, Modern India, National council of Educatioal Research and Training, New Delhi, 1984, page-124.

২৮. Susobhan sarkar, On the Bengal Renaissance, Calcutta, Papyrus, 1979, p-14

২৯. সুশোভন সরকার, বাংলার রেনেসাঁস, পৃ. ৮৯

৩০. Bipan chandra, Modern India, p-125

৩১. সুশোভন সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

৩২. ঐ , পৃ. ১৬

৩৩. ঐ , পৃ. ৮৮

৩৪. উদ্ধৃত, পশ্চিমবঙ্গ, রামমোহন সংখ্যা, ১৪০৩, পৃ. ৪৮

৩৫. Susobhan Sarkar, op. cit., p-14-15

৩৬. Bipan chandra, op. cit., p-127

৩৭. সুশোভন সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

৩৮. ঐ , পৃ. ৩৮

৩৯. স্বপন বসু, বাংলায় নব চেতনার ইতিহাস, কলিকাতা, পুস্তক বিপণি, ২য় সং, ডিসেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ২১৩

৪০. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ১ম খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী. ১৯৮৩, পৃ. ৪৩

৪১. অজিতকুমার ঘোষ ও অন্যান্য (সম্পাদিত), রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩, ভূমিকা, পৃ. ২৫

৪২. ঐ , পৃ. ২৫

৪৩. উদ্ধৃত, স্বপন বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

৪৪. সুশোভন সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪

৪৫. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫

৪৬. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, মুক্তধারা, নভেম্বর, ১৯৭১, পৃ. ২২

৪৭. মোহাম্মদ আজিজুল হক, বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম অনূদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯, পৃ. ৫৫

৪৮. "One of the directors of the company bluntly stated that the English had just lost America for their folly, in having allowed the establishment of schools and colleges in new world and that it would not be wise to repeat the same act of folly in regard to India."

Amitava Mukherjee, Reform and Regeneration in Bengal (1774-1823), Calcutta, 1968, p-72

আজিজুর রহমান মল্লিক, বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান, দিলওয়ার হোসেন সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১৮৬

আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

৪৯. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

৫০. ঐ , পৃ. ২৩

৫১. ঐ , পৃ. ৩৮

৫২. Nimai Sadhan Bose, The Indian awakening and Bengal, Calcutta, 1969, p-26

৫৩. কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ, ঢাকা, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, ১৯৯০, পৃ. ৫৯

৫৪. কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লিঃ, ৪র্থ সং, ১৯৯৯ পৃ. ১২৯-৩০

৫৫. কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

৫৬. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৮

৫৭. ঐ , পৃ. ১২৩

৫৮. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৭

৫৯. ঐ , পৃ. ৯৭

৬০. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৭

৬১. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

৬২. ঐ , পৃ. ৩৮

৬৩. উইলিয়াম এ্যাডামেরর রিপোর্টে লেখা হয় ঃ- "Learned Musalmans are in general much better prepared for reception of European ideas than learned Hindus.

উদ্ধৃত, ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৭

৬৪. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৭-৯৮

৬৫. ঐ , পৃ. ৯৯

৬৬. বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির সংকট, জিয়াদ আলি সম্পাদিত, কলকাতা, নবজাত প্রকাশন, ১৯৭১, পৃ. ৯

৬৭. শিক্ষা-সংক্রান্ত রিপোর্টে মেকলে লিখেছেন ঃ- "I have never found anyone among themselves (orientalists) who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole literature of India and Arabia.

উদ্ধৃত, আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা-সাহিত্য, পৃ. ৫৭

৬৮. রশীদ আল ফারুকী, বাংলা-উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান, কলকাতা, রত্নাপ্রকাশন, ১৯৮৪, পৃ. ১০১

৬৯. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

৭০. মোহাম্মদ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

৭১. আবদুল মওদুদ, ওহাবী আন্দোলন, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ১২৩

৭২. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০২

৭৩. মীর মশাররফ হোসেন, 'আমার জীবনী', শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৮৪, পৃ. ১২১

৭৪. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৩

৭৫. উইলিয়াম হাণ্টার, দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস, আবদুল মওদূদ অনূদিত, ঢাকা, আহমদপাবলিশিং হাউস, জানুয়ারী, ১৯৯৬, পৃ. ১০৪

৭৬. A. R. Mallick, British Policy and the Muslims of Bengal, Dacca, 1961, page-193

উদ্ধৃত, আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা-সাহিত্য, পৃ. ৩৯

৭৭. উইলিয়াম হাণ্টার পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯

৭৮. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪

৭৯. মোহাম্মদ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

৮০. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৪

৮১. অমলেন্দু দে, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২য় মুদ্রণ, জুলাই ১৯৯১, পৃ. ১০৭

৮২. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪-৫৫

৮৩. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩

কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭-৯৮

স্বপন বসু, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পৃ. ২২১

৮৪. কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭

৮৫. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩

৮৬. মোহাম্মদ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭-৩০

অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২

কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪-০৫

৮৭. কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯

অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯-১১০

৮৮. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৮

৮৯. ঐ, পৃ. ১০৯

৯০. কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭

৯১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১০-১১২

৯২. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬

ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১

৯৩. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭

৯৪. ঐ, পৃ. ৮৭

৯৫. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫-২৬

৯৬. ঐ, পৃ. ১২৬

৯৭, ঐ, পৃ. ১২৬-২৭

৯৮. ঐ, পৃ. ১২৭

৯৯. ঐ, পৃ. ১২৭

১০০. ঐ, পৃ. ১২৯

১০১. ইসলাম প্রচারক, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১১, পৃ. ৭৫

উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩০

১০২. ইসলাম প্রচারক, অগ্রহায়ণ-পৌষ-১৩১০, পৃ. ৪১৮

উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমদ, পৃ. ১৩০

১০৩. মিহির ও সুধাকর, ১৪ আশ্বিন ১৩১১, পৃ. ৪

উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমদ, পৃ. ১৩২

১০৪. মিহির ও সুধাকর, ২৩ মাঘ ১৩০৯

উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমদ, পৃ. ১৩১

১০৫. কাজী ইমদাজুল হক, আমাদের শিক্ষা, নবনূর, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমদ, পৃ. ১৩২

১০৬. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

১০৭. ঐ, পৃ. ১৯

১০৮. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

১০৯. কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ, পৃ. ৪২

১১০. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

১১১. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪

১১২. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

১১৩. ঐ , পৃ. ১০

১১৪. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

১১৫. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ডি. এন. বি. এ. ব্রাদার্স, ১৯৬৬, পৃ. ১৬

১১৬. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯-২১

১১৭. নরহরি কবিরাজ, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা, কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ৬৪

১১৮. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

১১৯. উইলিয়াম হাণ্টার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩

১২০. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬

১২১. উইলিয়াম হাণ্টার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪

১২২. ঐ , পৃ. ১০৪

১২৩. উইলিয়াম হাণ্টার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪-১০

অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫-১০৬

আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

স্বপন বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭-০৮

১২৪. উইলিয়াম হাণ্টার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

১২৫. অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬

স্বপন বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১১-১২

১২৬. স্বপন বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১১-১২

১২৭. উইলিয়াম হাণ্টার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১

১২৮. অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪

আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫-১৬

১২৯. উইলিয়াম হাণ্টার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭

১৩০. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

১৩১. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮-৩৯

১৩২. অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫

১৩৩. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬

ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১

১৩৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯,৩৬

১৩৫. ঐ , পৃ. ৬৪

১৩৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য, কলকাতা, ১৩৭৯, পৃ. ২৭

১৩৭. নরহরি কবিরাজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

১৩৮. বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য ঃ সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭০, অথবা ঃ সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ডি.এন.বি.এ. ব্রাদার্স, জুলাই ১৯৬৬।

১৩৯. Ramesh chandra Majumder, Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century, Calcutta, 1950, p-18

১৪০. যোগেশচন্দ্র বাগল, মুক্তির সন্ধানে ভারত, কলকাতা, ১৩৭৯, পৃ. ৬৬-৮৩

১৪১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা, ৩য় সং, ২০০০, পৃ. ৩৩

১৪২. অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১-৯৫

১৪৩. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫

১৪৪. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪-১৩৭

১৪৫. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬১

১৪৬. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪

১৪৭. ঐ , পৃ. ৮৪

১৪৮. ঐ , পৃ. ৮৬

১৪৯. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮

১৫০. ঐ , পৃ. ১৬৪

১৫১. কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ, কলিকাতা, ১৩৬৩,পৃ. ১২৮

১৫২. Pradip Kumar Lahiri, Bengali Muslim thought: 1818-1947, Calcutta, K.P. Bagchi & co., 1991, P-64

১৫৩. Amit Sen, Notes on Bengal Renaissance, 2nd ed., Calcutta, 1975, P-59

১৫৪. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬১-৬৩

১৫৫. বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে স্বদেশী আন্দোলনকে যে সমস্ত মুসলমান নেতা, লেখক ও বিশিষ্ট ব্যক্তি সমর্থন করেছিলেন তাঁরা হলেন ঃ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, আব্দুর রসুল, আবদুল হালিম গজনভী, লিয়াকত হোসেন, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, আবদুল গফুর সিদ্দিকী প্রভৃতি। তবে মুষ্টিমেয় এই সমস্ত ব্যক্তি বিপুল সংখ্যক সাধারণ মুসলিম সমাজে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি।

১৫৬. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫

Amit Sen, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫

১৫৭. অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৯

১৫৮. বিনয় ঘোষ, বাংলার নব জাগৃতি, পৃ. ৭১

১৫৯. Pradip kumar Lahiri, op cit. p-66

১৬০. আবুল আহসান চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন ঃ সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, আগষ্ট, ১৯৯৬, পৃ. ২০

১৬১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৬

১৬২. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত. ১ম খণ্ড, পৃ. ৪

১৬৩. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫

অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১

বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪

P.K. Lahiri, op cit, P-5

১৬৪. অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১-২২

১৬৫. রুবেন লেভী, সোস্যাল স্ট্রাকচার অব ইসলাম, ডঃ গোলাম রসুল অনূদিত, কলকাতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৫,

পৃ. ২৩

তুলনীয়, অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২-২৫

ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫-১৮

১৬৬. অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩

ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭

P. K. Lahiri, Op cit, p-3

১৬৭. অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪

ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮

১৬৮. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮-২২

১৬৯. সেখ আবদোস সোবহান, "হিন্দু মোসলমান", ১৮৮৮

উদ্ধৃত, কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৭

১৭০. ঐ, পৃ. ২২০

১৭১. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩

১৭২. "তফসীরে মা-আরেফুল কোরআন", সুরা নিশা, আয়াত নং ৩, মুহিউদ্দীন খান কর্তৃক বাংলায় অনুদিত, দেওবন্দ, উত্তর প্রদেশ, বাংলা ইসলামিক একাডেমি, সংখ্যা-৭, পৃ. ৩১৭-৩১৮

১৭৩. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

১৭৪. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪-৬৫

১৭৫. Edwin R. A. Seligman (ed.), Encyclopaedia of Social Sciences, Vol-9, New York, The Macmillan Company, 1950, P-407

উদ্ধৃত, উয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮

১৭৬. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮-৫২

১৭৭. বিনয় ঘোষ, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, কলিকাতা, ১৯৬৮, পৃ. ৬৪

১৭৮. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬-৮

১৭৯. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫-৫১